বাউল রাজা

রণজিৎ কুমার সেন

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট। ক লি কা তা ৬

BAUL RAJA

Life-Novel of Lalan Fakir

The King of Bauls

By

Ranajit Kumar Sen

প্রথম সাহিত্যলোক সংস্করণ, ১৯৫৯

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : সত্যব্রত অধিকারী

মুদ্রক : নেপালচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

বাউল রাজা লালন ফকিরের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

কেউ বলে গৌরী, কেউ বলে গড়াই; পদ্মা এখানে এসে গৌরী হয়েছে। দিগন্তপ্রবাহিণী গৌরী উচ্ছল তরঙ্গ তুলে আপন লাস্যে বয়ে চলেছে। মানুষের কলুষপঙ্কিল মনকে গৌরী তার মাতৃবক্ষের পীযূষ দিয়ে পূতশুদ্ধ ক'রে তুলেছে। উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গে কখনও সে ভীষণা, আবার শান্ত-মৌন স্তব্ধতায় কখনও সে প্রসন্নময়ী। দক্ষিণে তার বনরাজিনীলা ভাণ্ডারিয়া। লোকের মুখে মুখে ভাণ্ডারিয়া আজ ভাড়ারা হয়েছে। ভাঁড়ারা আর চাপড়া পাশাপাশি গ্রাম; মাঝ-বরাবর সোজা পশ্চিমমুখী যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেখানে 'নৃত্যবুড়ি' আর বাউল দাসদের বাড়ি। ধর্মের মালা ঘুরিয়ে এরকম অনেক বুড়ি এখনও চাপড়ার মতো অনেক গ্রামে ছড়িয়ে আছে—গ্রামের মুরুব্বিরা যাকে খাতির করে, সমীহ করে। লোকে বলে—বাউল দাসদের ঊর্ধ্বতন পরিবারদের নামানুসারেই এ পাড়ার নাম হয়েছে দাসপাড়া। সময়টা অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের শেষযাম—যে কালে এসব গ্রামের জীবন ছিল মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবু জমিদারের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে খুব যে কেউ ব্যক্তিগত জমি ভোগ করতে পেরেছে, এমন নয়। এখানে বাউল দাসও যা, লালন করও তাই। দাসপাড়ায় দো-চালা দু'খানি ঘর নিয়ে বিধবা মা পদ্মাবতী আর স্ত্রী দয়াকে নিয়ে থাকে লালন। কেউ তাদের পদবী বলে কর, কেউ বলে রায়; লালনের বাবার পদবীটা ছিল বোধ করি কর-রায়, অধস্তন বংশে এসে সে পদবীটা এখন ভেঙে ভেঙে ব্যবহৃত হচ্ছে। লালনের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, জিজ্ঞাসাও নেই কিছু।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে বেলাশেষে লালনকে নিয়ে এসে গৌরীর তীরে বসলো বাউল দাস। পা দু'খানি গৌরীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে বললো, 'একটা ডিঙি থাকলে এসময়ে তুই আর আমি দিব্বি ভেসে পড়তে পারতাম।'

মনে মনে খানিকটা ঘরের টান ছিল লালনের। দয়া হয়তো ঘরে

এতক্ষণ তার জন্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। মা বিধবা মানুষ, নিজের কাজকর্ম আর আহ্নিক নিয়ে থাকেন। সে ভিন্ন সারা বাড়িতে দুটো মনের কথা খুলে বলবার আর দ্বিতীয় লোক কোথায় দয়ার ? দয়ার কথাটাই তাই বিশেষ ক'রে মনে পড়ছিল লালনের।

বাউল দাস বললো, 'কি রে, কথা বলছিস না যে! দেখ, দেখ, আকাশের ঐ পুবদিকে একবার তাকিয়ে দেখ, কেমন লাল হয়ে উঠেছে, এখুনি চাঁদ উঠবে। নদীতেও জোয়ার এলো বলে। এমনি ক'রে এখানে আর তবে বসে থাকা যাবে না। জলে ভ'রে যাবে।'

লালন মুখ তুলে পুব আকাশের দিকে একবার তাকালো। সত্যিই চাঁদ উঠছে। আজ বোধ করি পূর্ণিমা। জোয়ারের যৌবনভারে ফুলে উঠবে গৌরী। নদীর সঙ্গে নারীর বুঝি এতটুকুও পার্থক্য নেই। যৌবন এলে নারী যেমন তার পীনোদ্ধত দেহভারে উচ্ছল হয়ে ওঠে, ওঠে উজ্জ্বল হয়ে, নদীও তেমনি। নারীর যৌবনের মতো নদীরও যৌবন।— কেমন একটা অদ্ভুত ভাবাবেশে গৌরীর উচ্ছল জলধারার দিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনে একবার গুণ-গুণ ক'রে সুর ধরলো লালন—

মধুর দিলদরিয়ায় যে জন ডুবেছে,
সে না সব খবরের জবর জেনেছে।...

বাউল দাস বললো, 'গা না, গলা ছেড়ে গা না একখানা ?'

তার মুখের দিকে এবারে চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে লালন জিজ্ঞেস করলো, 'গান শুনবি তো ঘরে ফিরবি কখন ?'

—'তোর শুধু ঘর আর ঘর।' বাউল দাস বললো, 'সংসারে কি আর কারুর বউ আছে, তারা বোধ করি সন্ধে হলে আর কথা নেই, অমনি ঘরে ফেরে! এর পর তোকে সবাই স্ত্রৈণ বলবে।'

মুখ টিপে হেসে লালন বললো, 'দয়ার মতো বউ হলে স্ত্রৈণ হয়ে সুখ আছে। তুই তো চাষের জমিতে কেবল লাঙলই দিলি, বউ আর ঘরে আনলি নে। বউয়ের মর্ম তুই কি বুঝবি ?'

—'থাক্, বুঝে আর দরকার নেই, তার চাইতে এই বেশ আছি।'

—'তা—তুই-ই না হয় একখানা শোনা, দু'দণ্ড বসি।'

বাউল দাস বললো, 'তোর কাছে আমার গলা! এই গলায় আমি শোনাবো তোকে গান? তবেই হয়েছে।'

'—তবে ওঠ; মিছেমিছি দেরি ক'রে লাভ নেই।' বলে নিজে থেকেই এবারে উঠে পড়লো লালন, বললো, 'সংসারে মাও যেমন একা, দয়াও তেমনি একা; আমি ঘরে গিয়ে পৌঁছালে তবে ওরা খানিক নিশ্চিন্ত হয়। চল্, উঠে পড়্।'

অগত্যা এবারে উঠতে হলো বাউল দাসকে। বললো, 'তুই একেবারেই বেরসিক; শুধু সংসার আর সংসার। কেমন সোনার থালার মতো গৌরীর বুক থেকে একটু একটু ক'রে চাঁদ উঠে আসছে আকাশের গায়ে, দেখতে দিলি নে।'

হেসে লালন সুর ক'রে বললো—

হিরে মন জহরা কাটি ময়।
সে চাঁদ লক্ষ যোজন দূরে রয়।
সে চাঁদ পাতালে উদয় ব্রহ্মতলে,
সে চাঁদ মৃণাল ধরে উজান ধায়।...

বাউল দাস বললো, 'তোর মতো আমি যদি গান বাঁধতে পারতাম, তবে চাষ-আবাদে লেগে না থেকে বেরিয়ে পড়তাম ঘর ছেড়ে; গান গেয়ে মাতিয়ে দিতাম গোটা দেশটাকে।'

হেসে লালন বললো, 'আগে নিজের ঘর মাতা, তবে তো দেশ। ঘরের বাঁধন যে বড় শক্ত বাঁধন রে বাউল!'

উত্তরে বাউল দাস যেন কি একটা বলবে মনে ক'রেও বলতে পারলো না।

পথ চলতে চলতে লালন আবার আপন খেয়ালে গাইতে শুরু করলো—

আজ আমার কর্মদোষে বেড়াই ভেসে ডুবতে নারীর
প্রেমসাগরে।
হ'ল না গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রতি গতি হবে গো মোর
কেমন করে?

বৃথা এ ভবে এলাম, কাজ হারালাম, পড়িলাম চিড়ার
বাইশ ফেরে।
পড়ে এই মায়ার জালে হাতে গলে বন্দী হলেম একেবারে।
কি দিয়ে করবো ভজন? দেহ শোধন হল না গুরুর দরবারে,
আমার এই জীবনের ধিক্ হয়ে ঠিক ভুলেছে ঠিকের ঘরে।
নয়নে লালন বাঁধা একে সুধা গরল খেলাম একই বারে,
যাদু বিন্দু দুর্জন বিষম কুজন, কুপথে যায় বারে বারে॥

গাইতে গাইতে নিজের ঘরের দাওয়ায় এসে একসময় দাঁড়িয়ে পড়লো লালন।

ঘরের মেঝেয় বসে দয়া তখন আপন মনে কি একটা করছিল, লালন কাছে এসে দাঁড়ালেও সে মুখ তুলে তাকালো না। এবারে তার সামনে বসে পড়ে অনুচ্চকণ্ঠে লালন বললো, 'বুঝেছি তুমি রাগ করেছ, কিন্তু জানো তো আমি পুরুষ মানুষ, কাজেকর্মে বাইরে না বেরোলে কি চলে। ছিঃ, রাগ করে না, মুখ তোলো।'

কিন্তু মুখ তুলতে গিয়েও কেন যেন সহজ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে পারলো না দয়া; বললো, 'আর আমি মেয়েমানুষ বলে দিনরাত একা ঘরে দাঁতে দাঁত চেপে থাকবো, এই তো?'

—'সেই একই পুরনো প্রশ্ন তো!' লালন বললো, 'বলি, দিনরাত আমাকে আঁচলে গেরো বেঁধে বন্দী ক'রে রাখলেই কি তোমার ভালো লাগতো? তখনও দেখতে, বিষিয়ে উঠেছ। ঈশ্বর পুরুষকে তাই বাইরে কাজ দিয়ে তার ঘরের প্রেমকে মধুর ক'রে তুলেছেন। লক্ষ্মী তো দয়া, রাগ করে না, এস, কথা বলি।'

চোখের দৃষ্টিকে এবারে অনেকখানি সহজ ক'রে এনে দয়া বললো, 'যে মানুষের দেখা না পেয়ে আত্মীয়স্বজনেরা বাড়ি বয়ে এসে মুখ বুজে চলে যায়, সেই মানুষ বসে বসে আমার সঙ্গে কথা বলবে, এমন ভাগ্যই করেছি!'

লালন জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, এর মধ্যে কে আবার এমন আত্মীয় এলো?'

—'আবার কে, তোমার মাস্তুতো ভাই, ভৌমিক দাদা।'

কথা শুনে এবারে হেসে ফেললো লালন, বললো, 'তাই বলো. আনন্দদা এসেছিলেন! তবু আনন্দদা এসে মাঝেমধ্যে খোঁজ-খবরটা নিয়ে যান! আমি কালই সকালে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা ক'রে আসবো।'

নিজের শোবার ঘরের মেঝেয় বসে বোধ করি সেই মুহূর্তেই সান্ধ্য আহ্নিক শেষ ক'রে উঠলেন পদ্মাবতী; গলা উঁচিয়ে বললেন, 'বলি, লালন কি বাড়ি এলি?'

—'যাই মা।' বলে এবারে একলাফে নিজের ঘরের দাওয়া ছেড়ে সোজা মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো লালন, বললো, 'তুমি এতক্ষণ আহ্নিক করছিলে বলে কাছে আসিনি; তা—আনন্দদা এসেছিলেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ, এই তো সে কিছুক্ষণ হলো উঠে গেল।' থেমে পদ্মাবতী বললেন, 'আমাদের কোনো কুলে কেউ তো খোঁজ নেবার নেই। তবু তোর মাসীর বংশের দত্তক ছেলে আনন্দ আর অনন্ত এসে মাঝে মাঝে আত্মীয়তা রক্ষা ক'রে যায়।'

কেমন একটা উদাসীন কণ্ঠে এবারে লালন বললো, 'সত্যিই আমাদের কেউ নেই মা, তাই না?'

—'থাকলে আর দুঃখ ছিল কি বাবা!' ছেলের মুখের দিকে স্নেহকাতর দৃষ্টি তুলে পদ্মাবতী বললেন, 'তাইতো তুই দু'দণ্ড চোখের আড়াল হলে আমার সারা বুক কেবল তোলপাড় করে। আর তুইও তেমনি, কখন যে কোথায় থাকিস, তার ঠিক নেই।'

মুখ টিপে হেসে লালন বললো, 'এমন কথা জোরে বোলো না মা, লোকে শুনলে হাসবে; বলবে—বুড়োধাড়ি ছেলেকে নিয়ে মায়ের কি আদিখ্যেতা দেখ।'

পদ্মাবতী বললেন, 'এ তুই বলিস কি লালন? মায়ের কাছে ছেলে কখনও বুড়ো হয়? যদি কেউ কখনও অমন কথা বলে তো বলতে দে, তবু তুই যেন আমার কাছছাড়া হ'স নে।'

লালনের মুখে এবারে কথা নেই ; মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু খুশির হাসি হাসতে লাগলো।

থেমে পদ্মাবতী বললেন, 'তোর বাবা তো কিছুই রেখে যেতে পারেননি, থাকবার মধ্যে বিঘে তিন-চার যা জমি আছে। যেবার ভালো চাষ না পড়ে, ভালো ফসলও দেয় না জমি। এবারে তুই বরং চাষীদের সঙ্গে কিছু একটা বন্দোবস্ত কর্ ; দু'মুঠো বেশি ধান চাষী নিক, ক্ষতি নেই, তবু ভালোমতো ঘরে কিছু আসুক। তুই চিরকালের যে পাগল, না বসলো ঘরে মন, না বসলো জমিতে। আমি না হয় বিধবা মানুষ, কিন্তু তোর আর বৌমার কথাটাও তো একবার ভেবে দেখবি। তোদের ভবিষ্যৎ আছে, তা ছাড়া সংসারও তো আর চিরকাল এই সংসার থাকবে না, বাড়বে। তাই বলি কি, জমির দিকে এবারে একটু ভালো ক'রে নজর দে বাবা।'

লালন বললো, 'তুমি বলবে, তবে আমি নজর দেবো, এই তুমি ভেবে রেখেছ মা? এই তো আজ দুপুরে গিয়েই একবার তদারক ক'রে এলাম। যা ধান আর কলাই ফলেছে, দেখে তুমি খুশি হবে।'

স্মিতমুখে এবারে পদ্মাবতী বললেন, 'সত্যি? তোর বন্ধুদের নেমন্তন্ন ক'রে এবারে তবে নবান্ন খাওয়াবো, নবান্নের উৎসব করবো ঘরে।'

—'তুমি তো কেবল লোক ডেকে ডেকে খাওয়াতে পারলেই খুশি!' লালন বললো, 'তোমার মতো অন্নপূর্ণা মা যার ঘরে, তার জমির ফসল নিয়ে এত ভাববারই বা কি আছে মা? আমার কাছে তুমি আর খামারের মাটি দুই-ই এক ; তুমি আছো, তাই আমার সব আছে। কোনো কিছু নিয়েই আমার কিছু ভাবনা নেই মা।'

পদ্মাবতী এবারে আর কিছু একটাও বললেন না, শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লালনও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে একসময় নিজের ঘরের দিকেই আবার পা বাড়ালো।

দুই

খামারের কাজ শেষ হতে হতে সেদিন বেলা প্রায় পড়ে এসেছিল। হাঁটতে হাঁটতে আপন মনেই একসময় এসে নদীর তীরে বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নিল লালন। বড় ধকল গেছে আজ। নদীর ফুরফুরে হাওয়ায় দু'চোখ তাই জড়িয়ে আসছিল। খেয়াঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে। কে একজন মাঝি যেন সারিন্দা বাজিয়ে তখন গান ধরেছে, তার সঙ্গে ধুয়া ধরেছে দু'তিনজন। গানের সুর কানে ভেসে আসতেই কান দুটো খাড়া ক'রে ঠিক হয়ে বসলো লালন। এসব অঞ্চলে মাঝিদের গানে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। লালন নিজে গায়ক, গানের কথাগুলি এসে লালনের মনটাকে তাই এক মুহূর্তে উতলা ক'রে তুললো।—

'বিন্দে লো, পায়ে ধরি, তুই একা কেন আলি ?
পায়ে ধরে সেধেছিলাম, তারে কোথা থুলি ?
বিন্দে লো তোর পায়ে ধরি,
এনে দে আমায় বংশীধারী,
মন-আগুনে পুড়ে মরি, বরণ হলো কালি।'...

গৌরীর উচ্ছল জলপ্রবাহে গানের সেই সুর ভাসতে ভাসতে হয়তো সেই কেলিকদম্বের ছায়ার পথে চলেছে—যেখানে বংশীধারী তাঁর বংশীনিনাদে গোপবালাদের বিরহতাপিত হৃদয়ে প্রেমের লহরী তুলছেন। সমস্ত মনটাকে সেই সুরের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল লালন। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডেকে উঠলো। মুখ তুলে তাকাতেই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো বাউল দাস; সঙ্গে কানাই আর ভরদ্বাজ। সকালে বাড়িতে বাড়িতে খঞ্জনী বাজিয়ে টহল দিয়ে ফেরে।

বাউল দাস বললো, 'আজ বোধ করি তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার খুব একটা তাগিদ নেই, তাই না লালন ?'

লালন বললো, 'তাগিদ আছে, তবে মাঝিদের গানটা বড় ভালো লাগছিল, বসে বসে তাই শুনছিলাম। তা—যাচ্ছিলি কোথায় ?'

—'ভরদ্বাজের ঘরে দুপুরে আজ নেমন্তন্ন ছিল।' বাউল দাস বললো,

'খেয়ে দেয়ে দুপুরটা গড়িয়ে ওদের সঙ্গে নিয়েই দু'পা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ তোকে চোখে পড়ে গেল।'

—'তা ভালোই হলো। বোস।'

বসতে বসতে বাউল দাস বললো, 'আসতে আসতে কানাই আর ভরদ্বাজকে বলছিলাম—কোথায় কোথায় নাকি ইস্পাতের লাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলছে। আমরা তা আর চোখে দেখলাম না।'

লালন বললো, 'কলের গাড়ি চোখে দেখে কি হবে রে? শুনি নাকি ইংরেজ এই রেলগাড়ি চালিয়ে কত জায়গায় কত চাষীর অন্ন মেরেছে। তার চাইতে আমাদের এই নদী-নালা আর নৌকোর দেশে এই তো বেশ আছি আমরা।'

বাউল দাস বললো, 'কলিতে বাস ক'রে কলগাড়ি চোখে দেখবো না, সেই বা কেমন?'

—'যেমন তুই একটা আস্ত বোকা, তেমনি।' লালন বললো, 'সুখে থাকতে তোকে ভূতে কিলোয়।'

শুনে কানাই আর ভরদ্বাজ এবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। কিন্তু বাউল দাস তাতেই চুপ ক'রে রইল না। রেলগাড়ি না আছে, নৌকো তো আছে। বললো, 'সামনে মস্ত যোগ আসচে। কানাই আর ভরদ্বাজ বহরমপুরের ওদিকে গঙ্গাস্নানে যাবে বলছিল; ভেবেছি—আমিও সঙ্গ নেবো। তা—তুইও চল্ না লালন! নৌকোয় যাবো, নৌকোয় ফিরবো, অসুবিধে কি?'

বিস্ময়ের কণ্ঠে লালন বললো, 'বলিস কি, যোগে তোরা সব গঙ্গাস্নানে চললি?'

কানাই আর ভরদ্বাজ এবারে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলো, 'মিছেমিছি তুমিই বাদ যাবে কেন? যখন যাচ্ছি, তখন একসঙ্গেই না হয় স্নানটা সেরে আসি চলো। একঘেয়ে জীবনের ফাঁকে ক'টা দিন একটু বেড়ানোও তো হবে!'

কথাটা মন্দ নয়। একটুকাল ভাবলো লালন। সত্যিই বড় একটানা একঘেয়ে জীবন। এ জীবন তো সত্যিই সে কোনদিন

চায়নি! যে জীবনে ভূমার আনন্দ নেই, যে জীবনে মহাকাশের স্পর্শ নেই, সে কি আবার জীবন! লালন বললো, 'তোরা তবে দিন ঠিক ক'রে নৌকো বায়না কর, আমি একবার মাকে আর দয়াকে বলি।'

বাউল দাস বললো, 'তোকে নিয়ে ঐ তো হয়েছে মুস্কিল। কথায় কথায় তোর কেবল মা আর বউ। ব্যাটাছেলের নাম ডোবালি তুই লালন।'

স্মিতকণ্ঠে লালন বললো. 'বাড়িতে ওরা বড় একা।, ইচ্ছে-খুশিমতো ওদের ছেড়ে তু'দিন গিয়ে যে কোথাও থাকবো, তাই বা পারি কোথায়? যেতে হলে ওদের দেখাশোনার কিছু একটা ব্যবস্থা তো ক'রে যেতে হবে!'

—'তবে আর তোর যাওয়া হয়েছে!' বলে অবজ্ঞার সঙ্গে এবারে ঠোঁট ওল্টালো বাউল দাস।

হেসে লালন বললো, 'ঘাড়ের উপর সংসারের চাপ তো নেই, তুনিয়াকে তাই বাঁকা ঠোঁট দেখাতে তোর বাধে না। কিন্তু উল্টে যখন বাঁকা ঠোঁট দেখবি, তখন বুঝবি।'

শেষপর্যন্ত সত্যিই তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়লো লালন। মাকে আর দয়াকে বলে অনেক ক'রে তবে সে মত করালো। বললো, 'ক'টা দিন বৈ তো নয়! এ ক'দিন অনন্তদা আর আনন্দদা এসে বরং তু'বেলা তোমাদের খোঁজখবর নিয়ে যাবেন, আমি বলে যাচ্ছি। দূরের পথ না হলে আমি তোমাকে আর তোমার বউকে নিয়ে গিয়েও স্নান করিয়ে আনতাম মা। এমন যোগাযোগটা আমি হেলায় ছেড়ে দিতে চাই না।'

পদ্মাবতী কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে লালনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুণ্য করতে যাবি, আমি কি তোকে বাধা দিতে পারি বাবা! কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠলো রে লালন! পথে কোনো বিপদ-আপদ নেই তো?'

—'বিপদ কেন থাকবে মা?' লালন বললো, 'নৌকোয় যাবো,

নৌকোয় ফিরবো। সঙ্গে বাউল, কানাই আর ভরদ্বাজ থাকবে। বিপদ-আপদ আবার কিসের মা? তোমার শুধু মিছেমিছি ভয়।'

—'ঈশ্বর করুন, কিছু যেন না হয়।' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন পদ্মাবতী।

স্বামীকে আড়ালে পেয়ে দয়া বললো, 'বাড়িতে থাকতেই কত কাছে থাকো, দূরে গিয়ে আবার চিন্তা! আমার জন্যে ভেবো না, নিজে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো, তা হলেই হবে।'

এতক্ষণে মনটাকে তবে তৈরী ক'রে নিতে পারলো লালন। পুণ্যসলিলা গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে আসবে সে; গঙ্গার আশীর্বাদ কুড়িয়ে আনবে সে মা আর দয়ার জন্যে।

যথাদিনে বেরিয়ে পড়লো সে বাউল দাস, কানাই আর ভরদ্বাজের সঙ্গে। নৌকোর গলুইয়ের উপর পা দিয়ে বাউল দাস বললো, 'সত্যিই এবারে তুই আমাদের আশ্চর্য করলি লালন। তোকে যে শেষপর্যন্ত নিয়ে বেরোতে পারবো, ভরসা ছিল না।'

লালন বললো, 'এবারে তোকে আমি বাঁকা ঠোঁট দেখাই, কি বলিস?' বলে ছইয়ের ভিতরে গিয়ে ফাঁকা পাটাতনের উপর বসে পড়লো লালন।

নৌকো ছেড়ে দিল।

কিন্তু এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এবারে আকাশের গুরু গুরু মেঘের ডাক কানে আসতেই মাঝির হাতের বৈঠাটা মুহূর্তের জন্য একবার শিথিল হয়ে গেল।

কানাই জিজ্ঞেস করলো, 'কি মাঝিভাই, দাওয়া নামবে নি?'

মাঝি বললো, 'এমুন ম্যাঘে সচরাচর তো দাওয়া নামে না, তবু বিশ্বাস করা কঠিন বাবাজী।'

গলা ছেড়ে ভরদ্বাজ বললো, 'একটু কিনার দিয়ে বেয়ে চলো, তা হলেই হবে।'

এবারে নদীর কিনারা ঘেঁষেই নৌকো চলতে লাগলো।

একসময় লালন বললো, 'বড় যে ভুল হলো কানাই!'

—'কেন, কি আবার ভুল হলো?' প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে চোখ দুটো তুলে ধরলো কানাই লালনের মুখের দিকে।

লালন বললো, 'চাল-চিঁড়ে সঙ্গে ক'রে কিছু নিয়ে না বেরোলে পথে যে ক্ষিদে পাবে, খেতে হবে, ঘর থেকে বেরোবার আগে এ-কথাটা একবারও মনে পড়েনি।'

শুনে তিন বন্ধু এবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বাউল দাস বললো, 'কেন, তোর দয়া কিছু সঙ্গে বেঁধে দেয়নি?'

লালন বললো, 'এ-পক্ষের ভুলটা ও-পক্ষে না ঘটলে লোকে আর সহধর্মিণী বলে কেন! এরপর ক্ষিদে পেলে খাবি কি তোরা?'

কানাই বললো, 'কেন, উপোষ দিতে পারবি না?'

—'তোরা পারলে আমিই বা পারবো না কেন!' বলে একবার কান খাড়া করলো লালন।

নৌকো যতই সামনের দিকে এগোচ্ছিল, জলের কলকল শব্দে গৌরী ততই মুখর হয়ে উঠছিল। শব্দটা বেশ লাগছিল লালনের। মনে হচ্ছিল—কোন দূর-দূরান্ত থেকে কে যেন ডাক পাঠাচ্ছে তার অন্তরে!

পাশ থেকে ভরদ্বাজ বললো, 'উপোস আর দিতে হবে না, অনেক খাবার সঙ্গে আছে। চারজনের এতেই চলে যাবে।' বলে পাটাতনে রক্ষিত একটা বড় পুঁটুলি তুলে লালনের চোখের সামনে উঁচিয়ে ধরলো সে।

হেসে লালন বললো, 'এতক্ষণ আমার সঙ্গে তোরা তামাসা করছিলি, বল?'

বাউল দাস বললো, 'ভরদ্বাজ আর তামাসাটা জমতে দিল কোথায়, চিঁড়ে-পাটালির পুঁটুলি দেখিয়ে সব মাটি ক'রে দিল!' তারপর থেমে বললো, 'তা—পেটের তাড়না থেকে যখন নিশ্চিন্ত হলি, তখন ধর্ দিকি এবারে যুৎসই একখানা গান!'

লালন বললো, 'কেন, তুই ধর না?'

আপত্তি করলো না বাউল দাস, বললো, 'বেশ, ধরবো, আগে তুই ধর।'

নৌকো একই ভাবে তরতর ক'রে জল কেটে চলছিল। আর-একবার সেইদিকে কান খাড়া ক'রে একটুকাল চুপ ক'রে বসলো লালন, তারপর আপন মনেই গান গেয়ে উঠলো—

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে,
আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি
দিবারাতি নাই সেখানে।
কত ধনীর ভারা যাচ্ছে মারা
পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা
তারাই নদীর ধারা জানে।
সপ্ততল পাতাল তলে
মূল রয়েছে যেইখানে,
মূলের মানুষ স্থূলে রেখে—
দেখতে পাবি রূপ রসানে।
লালন বলে মলেম জ্বলে—
দিবানিশি জলে-স্থলে,
যেমন মণিহারা ফণীর মত
হারা হলেম পিতৃধনে।

সঙ্গে মাঝে মাঝে ধুয়া ধরছিল কানাই আর বাউল দাস। গান শেষ হলে অনেকক্ষণ কেমন ভাবাবেশে বসে রইল লালন।

বাউল দাস বললো, 'মাঝে মাঝে তোকে গুরু বলে ডাকতে ইচ্ছে করে লালন। গান তো আমরা সবাই কিছু কিছু গাই, কিন্তু তোর মতো এমন তন্ময় হতে পারলাম না। ঘরে বসে তুই শাস্ত্র পড়লি না, মাঠে গিয়ে লাঙল দিলি আর মনে মনে গান বাঁধলি; অথচ আমরা যাঁকে ডেকেও ডাকতে পারলাম না, তুই তাঁর অনেক কাছে এগিয়ে গেলি। তোকে নিয়ে কি আমাদের কম গর্ব রে!'

কথাগুলো লালন ভালো ক'রে শুনলো বলে মনে হলো না।

মাঝির উদ্দেশে গলা ছেড়ে একবার জিজ্ঞেস করলো : 'গঙ্গায় গিয়ে আমরা কখন পৌঁছাবো মাঝি ?'

মাঝি বললো, তা—এক রাইত এক তুপুর লাগবে বাবাজী। মাঝে মাঝে আপনার মিঠা গলার গান শুনতে পেলে আমার হাতের বৈঠা আরও জোর পাবে, তাতে নদীর পথ কিছু কমতে পারে।'

—'বলো কি, আমার গান তোমার ভালো লাগছে ?'

—'গানে আপনি বড় ভালো কথা কন বাবাজী ; ইচ্ছা করে বৈঠা ছেড়ে বসে বসে শুনি।'

মুখ টিপে হেসে লালন বললো, 'তা হলে নদীর পথ তুমি কমাবে কি ক'রে ?'

—'আল্লার পথ আল্লাই কমিয়ে দেবে বাবাজী, আমি তো শুধু নাও বেয়ে চলেছি।' বলে নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে এনে একবার লালনের মুখের দিকে তাকালো মাঝি।

—'বেশ, তুমি তবে বৈঠা চালাও, আমি গাই।' বলে পুনরায় গান ধরলো লালন—

লীলা দেখে লাগে ভয় !
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডেঙ্গা বেয়ে যায়।
'আব্‌হায়াত' নাম গঙ্গা সেজে
সংক্ষেপে কেউ দেখে বুঁজে,
পলকে পাহাড় ভাসে
পলকে শুকায়।
ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার 'অচিন নলে,'
মুক্ত হয় সে ফুলে ফলে
তাতে কথা কয়।
গাঙ্গ জোড়া এক মীন ওই গাঙ্গে,
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে,

লালন বলে জল শুকালে
মীন যাবে হাওয়ায়।

এম্‌নি ক'রেই একসময় তারা গঙ্গায় এসে পৌঁছালো।

তিন

গঙ্গার ঘাট তখন পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গম্‌গম্‌ করছে। স্নানার্থীরা কেউ বা তিল-তুলসী হাতে নিয়ে কোমরজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করছে, কেউ বা আপন মনে জলকেলি করছে, কেউ বা কম্বুকণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ ক'রে গঙ্গার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন ক'রে বলছে—

'পশুনাং পতিং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বাসানং বরেণ্যম্‌।
জটাজুট মধ্যে স্ফুরদ্‌গঙ্গাবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি॥'

অর্থাৎ—'যিনি পশুপতি সর্বপাপবিনাশন পরমেশ্বর, যিনি গজাজিন পরিধান করেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহার জটাজুট মধ্যে স্বয়ং গঙ্গা প্রবহমানা, সেই একমাত্র মহাদেবকে আমি স্মরণ করিতেছি।' তারপর কৃতাঞ্জলিপুটের পুষ্পপদ্ম গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দিয়ে সূর্য-দেবতার প্রতি ভক্তি-নিবেদনের উদ্দেশে কিছুক্ষণ আনতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাকছে।

গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে লালনও কিছুক্ষণ মুদিত নেত্রে কোন্‌ দেবতাকে যেন একবার স্মরণ করলো, তারপর আপনমনেই গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিতে দিতে গেয়ে উঠলো—

মধুর দিলদরিয়ায় যে জন ডুবেছে,
সে না সব খবরের জবর জেনেছে।
পর্বতের উপরে গঙ্গা,
জলের ভিতরে ডাঙ্গা,
ডুবে ছ্যাখ্‌ না একবার ডুবে ছ্যাখ্‌ না,
ভুবনে ডাঙ্গা পাই,
উঠলে ভেসে যাই,
বিষম তরঙ্গে বড় তুফান রে।...

বাউল দাস, কানাই আর ভরদ্বাজও তখন জলে নেমে পড়েছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মনের সমস্ত পাপ, সমস্ত মলিনতা মুছে দিয়ে পূতশুদ্ধ হবার সে কি প্রাণান্ত প্রয়াস পুণ্যার্থীদের। চারদিকে স্নানার্থী-দের ভিড়। দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে আর নৌকোয় ভেসে পুণ্য-লোভীরা এসে ভিড় করেছে এই গঙ্গার ঘাটে।

স্নান সেরে সেই ভিড় ঠেলে একসময় পাড়ে উঠে এলো লালন। কিছুটা দূরে তখনও লগির গায়ে কাছি দিয়ে তাদের নৌকো বাঁধা রয়েছে। ভরদ্বাজ গিয়ে চিঁড়ে আর পাটালির পুঁটুলি খুলে চার ভাগ ক'রে নিল। জলের বুকে অদ্ভুত ফলাহার। সেই ফলাহার শেষ ক'রে যে যার মতো একসময় পাটাতনের উপর গা এলিয়ে দিল। এমনি ক'রেই একসময় সেদিনটা কেটে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে বাউল দাস বললো, 'মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরের গ্রামগুলো একবার ঘুরে দেখে গেলে মন্দ কি লালন, আবার কবে মা-গঙ্গা অনুগ্রহ ক'রে ডাকেন, তার তো ঠিক নেই!'

শেষ রাত থেকেই সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা গ্লানি বোধ করছিল লালন, অথচ মুখ ফুটে এতক্ষণ সে-কথাটা বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করেনি। এবারে বললো, 'তা বোধ করি আর আমার ভাগ্যে হলো না। সারা শরীরে কেমন যেন একটা চাপা ব্যথা বোধ করছি। বোধ করি জ্বর আসবে!'

চোখ কপালে তুলে কানাই বললো, 'তীর্থস্নানে এসে শেষপর্যন্ত তুমি জ্বর বাধিয়ে বসবে?'

মুখে ম্লান হাসির রেখা টেনে লালন বললো, 'ইচ্ছে ক'রে কেউ কি আর শরীরে জ্বর বাধায় ভাই! শরীরে রোগ এলে মানুষ কি করতে পারে বলো?'

বাউল দাস বললো, 'তুই তো তা হলে চিন্তায় ফেললি দেখতে পাচ্ছি!'

লালন বললো, 'তীর্থ করতে এসে শেষপর্যন্ত তোদের কষ্ট দেবো, এ যে আমার নিজেরই কষ্ট বাউল।'

—'আর তোর কষ্ট, একেবারেই ডোবালি তুই।' বলে এবারে

নৌকোর ছইয়ের উপরে উঠে গিয়ে বসলো বাউল দাস।...

কিন্তু লালন নিজেও যা ভাবতে পারেনি, শেষপর্যন্ত তা-ই হলো। জ্বরটা শেষ অবধি সত্যিই এলো এবং সেইসঙ্গে সারা গায়ে বসন্তের গুটি ফুটে উঠলো।

দেখে বাউল দাসের কণ্ঠে কথা ফুটলো না, কানাই আর ভরদ্বাজ ভয়ে নিজেদের মধ্যে একবার কেঁপে উঠলো।

কাতরকণ্ঠে লালন বললো, 'মা শীতলা এভাবে এই বিদেশ বিভূঁয়ে এনে আমাকে দয়া করবেন, ভাবতে পারিনি বাউল। এখন দেখছি—যোগস্নানে এসে সত্যিই তোদের কষ্ট দিলাম।'

মনে মনে বিরক্ত হয়ে বাউল দাস বললো, 'বেরোবার সময় যখন গড়িমসি করছিলি, তখনই ভাবছিলাম—কিছু একটা কপালে আছে। তা যাক, তুই বরং নৌকোর ওপাশে একটু আলাদা হয়ে থাক্; এ রোগ বড় ছোঁয়াচে।'

সারা গায়ে যেমন জ্বরের তাপ, তেমনি যন্ত্রণা। বাঘের চোখের মতো এক একটা গুটি বেরিয়ে সমস্ত দেহটাকে দেখতে দেখতে বিকৃত করে তুলেছে লালনের। সেই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে আর একবার জোর ক'রে চোখ দুটো মেলে সে বললো, 'আসিস নে, সত্যিই তোরা আমার কাছে আসিস নে। এভাবে তোদের কষ্ট দেবো জানলে আমি ঘর থেকে বেরোতাম না বাউল। মা'র আর দয়ার জন্যে মনটা বড় উতলা হয়েছে রে। আমার যদি এমন তেমন কিছু হয়, তবে যে ওদের দিকে তাকাবার আর একটি প্রাণীও থাকবে না সংসারে!'

বাউল দাস বললো, 'নে, হয়েছে; বাড়ির কথা আপাতত আর চিন্তা ক'রে দরকার নেই, এবারে চেষ্টা ক'রে একটু ঘুমো দিকি!'

মাঝি এতক্ষণ নৌকো ছাড়বার জন্যে অপেক্ষায় ছিল। এবারে বললো, 'গায়ক বাবাজীর যা অবস্থা হলো, এ তো ভয়ের কথা। তা—নাও কি ছাড়বো এবারে?'

বাউল দাস বললো, 'আর অপেক্ষা ক'রে কি হবে, ছাড়ো।'

ঘাট ছেড়ে নৌকো এবারে ধীরে ধীরে মাঝ গঙ্গায় এসে পড়লো।

কানাই বললো, 'আমরা তো যা হোক চিঁড়ে-পাটালি খেয়ে আছি, লালনের যে উপোসে কাটছে! যেরকম ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, এর পর যে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে!'

ভরদ্বাজ বললো, 'চিঁড়ে ভিজিয়ে সেই জল খাইয়ে দিলে বোধ করি মন্দ হয় না। দেখবে নাকি একবার চেষ্টা ক'রে বাউল?'

বাউল দাস বললো, 'নিজে থেকে ও কিছু খেতে না চাইলে জোর ক'রে ওকে কিছু খাওয়ানো উচিত হবে না। যেরকম জ্বর আর গা-ভর্তি গুটি, তাতে জোর ক'রে খাওয়াতে কিছু ভরসা হয় না।'

ভরদ্বাজ এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে গলুইয়ের পাশে গিয়ে মাঝির গা ঘেঁষে বসে আপন মনে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলো।...

শেষ রাত্রির দিকে বোধ করি জ্বরের তাপ আরও কিছুটা বাড়লো। বেঘোরে কিছুক্ষণ ভুল বকলো লালন, তারপর আপন মনে ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় একসময় গাইলো—

আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়, ঘিরে এলো কালে।
কত কত লক্ষ যোনি এমন করে জানি মানব দলে,
মন রে তুমি, এসে কি করলে? মানব দেলেতে
আবার কত দেবতা অঙ্কিত হয়, দিয়াছে কোল;
কালে ভুল না রে কারখানা, সুমজে করো বেচা-কেনা,
লালন কয় দল পাবে না এবার চলে গেলে।

নৌকোর পাটাতনে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল কানাই, ভরদ্বাজ আর বাউল দাস। লালনের গানের সুরে একসময় ঘুম ভেঙে গেল কানাই আর ভরদ্বাজের। চিরকাল ভোরে উঠে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে টহল দিয়ে বেড়ানো অভ্যাস। শেষ রাত্রিতে প্রতিদিনই তাই তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়। আজও উঠলো, উঠলো লালনের গানের আভাস পেয়ে। ভাবলো—হয়তো জ্বরটা তবে

কিছু ছেড়েছে। ভোরের দিকে নিশ্চয়ই ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকাবে লালন।

কানাই জিজ্ঞেস করলো: 'এখন কি শরীরে একটু আরাম বোধ করছো লালন?'

কিন্তু লালনের কণ্ঠে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ছইয়ের ভিতরের দিকে আর একটু ঝুঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো কানাই: 'আবার কি ঘুমিয়ে পড়লে লালন?'

কিন্তু এবারও লালনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ভরদ্বাজ বললো, 'মিছেমিছি ডাকিস নে। দুর্বল শরীর, যতটুকু পারে ঘুমোক। ভালোয় ভালোয় এখন গৌরীর ঘাটে পৌঁছে লালনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।'

কানাই বললো, 'পুণ্য করতে এসে কেউ কোনোদিন এমন রোগ বাধিয়ে নিয়েছে, শুনেছিস?'

—'শুনি নি, এবারে দেখছি।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল ভরদ্বাজ।

ভোরের আকাশ তখন তরুণ সূর্যের রক্তিম আভায় লাল হয়ে উঠেছে। মাঝির বৈঠা চালাবার কামাই নেই, সারা রাত সে জলের বুকে বৈঠা ফেলে নৌকো বেয়ে এসেছে। নিশুতি রাত্রির অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে গ্রামগুলি। কাছে দূরে পাখি আর মোরগের কিচিরমিচির আর কক্করক্-কক্-কক্ শব্দ ভেসে আসচে কানে। এ সময়ে কানাই আর ভরদ্বাজ রোজ টহল দিয়ে ফেরে বাড়িতে বাড়িতে, তারপর দুপুরে গিয়ে ভিক্ষালব্ধ ধন কুড়িয়ে এনে সংসারে ব্যয় করে। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকাতে গিয়ে ভুলে গেল তারা যে, একটি মুমূর্ষু রোগী অসাড়ে পড়ে ধুকছে ছইয়ের নিচে। চিরাচরিতভাবে নিজের অলক্ষ্যেই তাদের কণ্ঠে একবার টহলের গান ভেসে উঠলো। আপন মনে গুনগুন ক'রে তারা গাইল—

জাগো জাগো নগরবাসী, নিশি অবসান রে,
গৌর গোবিন্দ বলে উঠ রে কুতূহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে।

কত নিদ্রে যাও রে রাধে
কালা মাণিকের কোলে ?
রাই জাগে কি শ্যাম জাগে
শুক সারী বলে রে।'

বৈঠা থামিয়ে মাঝি বললো, 'আমরা এ সময়ে আজান দিয়ে নামাজ পড়ি। পাড়ে নাও লাগিয়ে আমি একবার নামাজ পড়ে নেই বাবাজী, কি বলেন ?'

কানাই বললো, 'নিজেরা ঠাকুর-দেবতার নাম ক'রে কি ক'রে বলি যে, তুমি আল্লাকে ডেকো না মাঝি ভাই। বেশ তো, নামাজ প'ড়ে নাও তুমি।'

মাঝি এবারে নৌকো পাড়ে ভিড়াতে লাগলো।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বাউল দাস সোজা হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো। 'কি ব্যাপার, পৌঁছে গেছি নাকি ?'

ভরদ্বাজ বললো, 'হঠাৎ কি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে তুমি ? এখনও যে আদ্ধেক পথও এলাম না, এখনও আমরা গঙ্গার বুকে। মাঝি নামাজ পড়বে বলে নৌকো পাড়ে ভিড়াচ্ছে।'

—'তাই বলো।' ব'লে একবার হাই তুলে হাতে তুড়ি বাজালো বাউল দাস।

ততক্ষণে নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে মাঝি। পাশ দিয়ে মানুষের পদচিহ্নিত কাচামাটির পথ এঁকে-বেঁকে জঙ্গলের পাশ দিয়ে গ্রামের ভিতরে চলে গেছে। গঙ্গার কূলে খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে ছোট্ট ঘাট পাতা। মনে হয়, গ্রামের লোকেরা এই ঘাটে স্নান করে, জল নেয়, বাসন মাজে। সেইদিকে তাকিয়ে পুনরায় বাউল দাস বললো, 'ঘাটে নেমে হাত মুখ ধুয়ে নিলে মন্দ হয় না, কি বলো ? তা—লালন এর মধ্যে জেগেছিল নাকি ?'

কানাই বললো, 'জেগেছিল সন্দেহ নেই। নিজের মনে অনেকক্ষণও গান করলো ; কিন্তু গান গেয়ে সেই যে চুপ করলো, আর সাড়া নেই।

কত ডাকলাম, জিজ্ঞেস করলাম—কেমন লাগছে, কিন্তু কে আর সাড়া দেয়!'

—'বলো কি?' বাউল দাস বললো, 'কাছের মানুষ, ডাকলে সাড়া দেয় না, মানে কি? রোগটাও এমন যে ছুঁতে সাহস হয় না, নইলে একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখতাম—জ্বরটা নামলো কিনা!'

ভরদ্বাজ বললো, 'তোমরা যাই বলো, আমার যেন কেমন ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না। তুমি একবার ভালো ক'রে দেখ বাউল। ছুঁলেই কি আর সবাইকে মা শীতলা দয়া করেন। একবার তুমি দেখ দিকি চেষ্টা ক'রে, সাড়া পাও কিনা!'

লালনের অনেকখানি কাছে এগিয়ে গিয়ে এবারে বাউল দাস ডাকলো: 'লালন, জাগবি না, জেগে কিছু খাবি না তুই? লালন, লালন—!'

কিন্তু তবু কোনো সাড়া নেই লালনের।

আর একবার ডেকে সেই একই কথা বললো বাউল দাস।

তবু নিরুত্তর লালন।

এবারে একরকম দুঃসাহসে ভর করেই নিজের হাতখানিকে লালনের হাতের দিকে বাড়িয়ে দিল বাউল দাস এবং সেই মুহূর্তেই তার মুখখানি হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সারা দেহ শক্ত হয়ে গেছে লালনের। মনে হচ্ছে না যে, দেহে প্রাণ আছে। সমস্তটা শরীর বসন্তের গুটিতে ফুলে উঠেছে, তাকানো যায় না সেদিকে। তবু তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাউল দাস।

ব্যাকুল কণ্ঠে ভরদ্বাজ জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছো অমনি ক'রে বাউল?'

উত্তরে বাউল দাস কি বলবে, সহসা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।

ভরদ্বাজের গা ঘেঁষে এবারে কানাই এসে মুখ বাড়িয়ে বললো, 'কি ব্যাপার কিছু বলছো না যে বাউল?'

শান্তকণ্ঠে এবারে বাউল দাস বললো, 'লালনকে এভাবে সঙ্গে

নিয়ে না এলেই পারতাম। ও আর বেঁচে নেই। চোখ দুটো কেমন স্থির হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে গেছে শরীর। কিন্তু এ অবস্থায় এখন কি উপায় করা যায়, বল্ তো ?'

কানাই আর ভরদ্বাজের মুখে এবারে কথা ফুটলো না। চোখের কোণে মনে হলো কেমন যেন জল এসে ভিড় করেছে। কোনোরকমে সেটুকু গোপন ক'রে নিয়ে ভরদ্বাজ বললো, 'লালন বেঁচে না থাকলে ওর সংসারটা যে একেবারেই ছারেখারে যাবে। আমরাই বা ওর মা আর বউকে গিয়ে কি জবাব দেবো !'

—'ফিরে গিয়ে ভাবতে হবে কি করা যায় !' বাউল দাস বললো, 'ও বোধকরি এমনি ক'রে মরবে বলেই এসেছিল। অথচ কী আশ্চর্য মৃত্যু, তাই ভাবছি।'

ততক্ষণে নামাজ সেরে মাঝি এসে পুনরায় নৌকোয় উঠেছিল। ব্যাপারটা জানতে পেরে নিজের মধ্যে হঠাৎ সে আঁৎকে উঠলো। বললো, 'বাবাজীর গান শুনতে শুনতে দিব্বি নদীতে বৈঠা ফেলে ফেলে আসছিলাম, হঠাৎ বাবাজী দেহ রাখলেন ? কিন্তু আমার যে আর নাও বাওয়া হবে না বাবাজীরা। নৌকোয় মড়া নিয়ে আমি নাও বাইতে পারবো না।'

এবারে আরও বেশী সমস্যায় পড়তে হলো তিন বন্ধুকে। লালনের মৃতদেহ নিয়ে তবে আর তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে তবে দেশে ফিরতে হবে।

কানাই আর ভরদ্বাজ বললো, 'ডেকে ডেকে যখন আর সাড়া পেলাম না, তার আগে লালন গাইছিল—

আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়, ঘিরে এলো কালে।

মনে মনে কালের গ্রাস অনুভব ক'রেই বোধ করি এ গান গাইছিল লালন। গানও শেষ হলো, লালনও ফুরিয়ে গেল। অথচ কাছে বসে থেকেও আমরা তা বুঝতে পারলাম না।'

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বাউল দাস যেন কি ভাবলো, তারপর

বললো, 'এখন সব বোঝাবুঝির বাইরে। এদিকে ক্রমেই বেলা বেড়ে উঠছে। নৌকো পাড়ি দিয়ে যেতে হবে তো বটেই। লালনকে বরং এখানেই মুখাগ্নি ক'রে এই ঘাটে অন্তর্জলি করে রেখে যাই। তা ছাড়া উপায় দেখছি না কিছু।'

এতবড় একটা কঠিন প্রস্তাবে মন থেকে সাড়া পেলো না কানাই বা ভরদ্বাজ, অথচ যে প্রতিবাদ করবে, তাও পারলো না। বাউল দাস নিজে থেকেই এবারে উদ্যোগী হয়ে লালনের দেহটাকে কোনোরকমে নৌকো থেকে নামিয়ে আবক্ষ গঙ্গায় ডুবিয়ে রাখলো, তারপর চোখ-মুখ বুজে কোনোভাবে তার মুখে আগুন ছুঁইয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে পুনরায় নৌকোয় এসে চেপে বসে বললো, 'মাঝি, এবারে নৌকো ছাড়ো।'

আকাশে তরুণ সূর্যের রক্তিম আভা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেও নৌকোর সারা পাটাতন জুড়ে যেন তখন নিশুতি রাত্রির মতোই কেমন একটা বিষণ্ণ অন্ধকার শুধু থম্‌থম্‌ করতে লাগলো।

চার

লালনের ফিরে আসতে দেরী দেখে দাসপাড়ার ঘরে বসে পদ্মাবতী এবং দয়া দু'জনেই অধীর হয়ে উঠছিল। অনন্ত কিম্বা আনন্দ ভৌমিক যখন-তখন এসে এমন-একটা খোঁজখবর নিতে পারতো না—যাতে পদ্মাবতী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। বিশেষ ক'রে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে লালনকে ছেড়ে এভাবে কোনো একটা দিনও তাঁকে কাটাতে হয়নি। তাই যতই এক একটা দিন যাচ্ছিল, মনে মনে বড় অধীর হয়ে উঠছিলেন পদ্মাবতী। সেদিন রাত্রির দিকে বাইরের দরজায় আচমকা কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে দয়ার উদ্দেশে গলা ছেড়ে তিনি বললেন, 'লালন বোধ করি ফিরে এলো। বাইরের দরজার আগলটা একবার নামিয়ে রেখে এস বৌমা।'

পাশের ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপের শিখাটাকে উস্কিয়ে দিয়ে বসে বসে সল্‌তে পাকাচ্ছিল দয়া, সাড়া দিয়ে বললো, 'যাই মা।'

স্বামীর কথা এ ক'দিন সেই কি কম ভেবেছে? কিন্তু মনের কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেনি। শাশুড়ির মুখে তাই লালনের আসার কথা শুনে খুশিমনে এবারে সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বাইরের দরজার আগল খুলে দিয়ে চুপিসাড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু লালন দূরে থাক, কাউকেই বড় একটা আসতে দেখা গেল না। শুধু একটানা অন্ধকারে মাঝে মাঝে দু'একটি জোনাকি জ্বলছে আর চারপাশ থেকে ঝিঁঝি ডাকছে।

ফিরে এসে শাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দয়া বললো, 'কই, আমাদের বাড়ির দিকে কাউকে তো আসতে দেখলাম না মা! আপনি হয়তো গাছের পাতা কিংবা ফল পড়বার শব্দ পেয়ে কারুর পায়ের শব্দ মনে করেছিলেন।'

বৌমার মুখের দিকে এবারে চোখ দুটোকে তুলে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে পদ্মাবতী বললেন, 'লালন আজও তা হ'লে ফিরলো না!'

দয়া কিছু-একটাও না বলে অর্ধ অবগুণ্ঠনের আড়ালে মুখখানি নিচু ক'রে নিয়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে ফিরবে লালন, তোমাকে কিছু বলে যায়নি বৌমা?'

এবারে মুখে কিছু-একটাও না বলে মাথা নেড়ে দয়া জানালো —'না।'

বিষণ্ণ মুখে পদ্মাবতী বললেন, 'শুনেছিলাম—দাসেদের বাড়ির বাউলও নাকি সঙ্গে যাবে! কাল সকালে বরং দাসেদের বাড়িতে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি—ওরা কিছু জানে কিনা! তুমি যাও বৌমা, শোও গিয়ে।'

এবারে আর মিছেমিছি দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা না ক'রে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো দয়া।

রাত্রিটা পদ্মাবতী কিম্বা দয়ার কি ক'রে কাটলো জানি না, কিন্তু ভোরে উঠে পদ্মাবতীকে গিয়ে আর দাসেদের বাড়িতে খোঁজ নেবার

দরকার হলো না। একসময় কানাই আর ভরদ্বাজকে নিয়ে বাউল দাস নিজে এসেই তাঁর সামনে দাঁড়ালো। অথচ কি ক'রে যে লালনের মৃত্যুসংবাদটা মুখ ফুটে প্রকাশ করবে, বুঝে উঠতে পারলো না।

উতলা কণ্ঠে পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কই, তোমাদের দেখছি, লালনকে যে দেখছি না!'

কানাই আর ভরদ্বাজ এবারে পরস্পর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দয়া এতক্ষণ সকলকেই লক্ষ্য করছিল। কিন্তু বাউল দাস কি বলবে, কি বলে এতবড় দুঃসংবাদ নিবেদন করবে, ভাবতে পারলো না।

আর-একবার তাড়া দিয়ে পদ্মাবতী বললেন, 'তোমরা এমন কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কখন গঙ্গাস্নান সেরে ফিরলে, লালন কোথায় রইল, কিচ্ছু যে বলছো না তোমরা?'

অনেক চেষ্টা ক'রে কম্পিতকণ্ঠে এবারে বাউল দাস বললো, 'ফিরেছি কাল সন্ধ্যায়, রাত ক'রে আর আপনাকে খবর দিতে আসিনি।'

—'মানে? কাল সন্ধ্যায় যদি ফিরেছ, তবে লালন কোথায় রইল?' ব্যাকুল কণ্ঠ এবারে আরও ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়লো পদ্মাবতীর।

বাউল দাসের পক্ষে এবারে আর সত্য গোপন করা সম্ভব হলো না। তেমনি কম্পিতকণ্ঠেই বললো: 'লালন গঙ্গাতেই থেকে গেল।'

মায়ের বুকের মধ্যে ততক্ষণে ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে দয়ার অন্তরে।

—'গঙ্গাতেই থেকে গেল মানে?'

বাউল দাস এবারে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বললো, 'আমরা তো সবাই গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম, কিন্তু লালনের মতো এমন ভাগ্য ক'রে কি যেতে পেরেছিলাম? সংসারে ওর মতো পুণ্যবান কে আছে? মা গঙ্গা তাকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছেন, এর মতো আর কি পুণ্য আছে?'

দরজার আড়ালে সহসা ঝুপ ক'রে একটা শব্দ হতে শোনা গেল মাত্র। নীরবে দাঁড়িয়ে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সহ্য করতে পারেনি দয়া, সহসা দাঁত কপাটি লেগে অচৈতন্য হয়ে সে মেঝেয় পড়ে গেল।

সেদিকে লক্ষ্য দেবার মতো তখন অবস্থা নেই পদ্মাবতীর। দারুণ একটা আর্তনাদে ভেঙে পড়ে বুক চাপড়ে তিনি বললেন: 'দল বেঁধে তবে কি এই সংবাদ শোনাতেই তোমরা আমার বাড়ি বয়ে এলে? এ আজ আমাকে কোন্ কথা শোনালে তোমরা? আমি যে এতদিন প্রতি-মুহূর্তে লালনের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করেছি, ঠাকুরের কাছে কল্যাণ ভিক্ষা করেছি তার! এ আজ কোন্ খবর নিয়ে এলে বাউল? আমি যে মুখ ফুটে এ কথা বউমাকে বলতে পারবো না! আমি অভাগী, আমিই বা কোন্ সুখে কি নিয়ে এ সংসারে বেঁচে থাকবো! এ তুমি আজ কি কথা শোনালে বাউল?'

অশ্রু যেন গঙ্গার ধারা হয়ে সারা বুক ভাসিয়ে দিল পদ্মাবতীর।

বাউল দাস বললো, 'মিথ্যে কেঁদে কি আর লালনকে ফিরিয়ে আনা যাবে! আপনি শান্ত হন মা; যান, গিয়ে বরং আপনার বউমার কাছে বসুন।' বলে এক পা দু'পা ক'রে কোনোরকমে কানাই আর ভরদ্বাজকে নিয়ে পদ্মাবতীর সামনে থেকে সরে গেল বাউল দাস।

কান্নায় কান্নায় পদ্মাবতী তখন সারা উঠোন অশ্রুতে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন, আর বুক চাপ্‌ড়ে চিৎকার ক'রে কেবলই বলছিলেন, 'তুই কোথায় গেলি বাবা আমার, তুই কোথায় গেলি লালন? আমি যে কোনোদিন তোকে চোখের আড়াল ক'রে থাকতে পারিনি! অভাগী মায়ের বুকে এ আজ কী আঘাত দিয়ে তুই চলে গেলি লালন?'

এমনি করেই সারাটা দিন কেটে গেল।

খবর পেয়ে একসময় অনন্তলাল আর আনন্দচন্দ্র এসে পদ্মাবতীর শিয়রে বসলেন। বললেন, 'অনিত্য সংসারে আমরা সব মায়ার জীব। আর যেখানে মায়া, সেখানেই দুঃখ। এই দুঃখ থেকে পৃথিবীর কোনো একটি মানুষেরও মুক্তি নেই। কিন্তু তা নিয়ে ব্যাকুল হওয়া বুদ্ধিমান

মানুষের কাজ নয়। বেঁচে থেকে হয়তো অনেক দুঃখ পেতো লালন, তার চাইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গা তাকে টেনে নিয়ে ভালোই করেছে। আপনি শান্ত হন। লালনের পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্যে শ্রাদ্ধের প্রয়োজন আছে। আমি ব্রাহ্মণকে খবর দিয়ে আনি, তিনি যা বিধান দেন, সেইমতোই আমরা কাজ করতে তৈরি হবো।'

অনেক বেলায় জ্ঞান ফিরে পাওয়া অবধি দয়া একই ভাবে ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল। সম্পর্কের দিক থেকে অনন্ত আর আনন্দ ভাসুর হয়, তাই তাদের সামনে এসে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

অথচ পদ্মাবতী মুখ ফুটে যে কিছু বলবেন, তা পারলেন না। অনন্ত আর আনন্দের কথার জবাবে শুধু তাদের মুখের দিকে অশ্রুসজল নেত্রে তাকিয়ে থেকে একই ভাবে স্থাণুর মতো বসে রইলেন।...

দেখতে দেখতে সারা ভাণ্ডারিয়া আর চাপড়ায় লালনের মৃত্যু-সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো। কোনোদিন যে-বাড়ির বউ এসে পদ্মাবতীর উঠোনে কখনও পা দেয়নি, সেও নিজে থেকে বাড়ি বয়ে এসে পদ্মাবতী আর দয়াকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে গেল।

শাঁখা সিঁদুর ঘুচে গেল দয়ার।

একসময় বৌমাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে পদ্মাবতী বললেন, 'চোখ মোছো বউ। সংসারে আমি যা হারালাম, সেই তুলনায় তোমার হারানো খুব বেশি নয়।'

কিন্তু সত্যিই কি পদ্মাবতীর তুলনায় কম হারালো দয়া? তার যে নিজের বলতে এ সংসারে আর দ্বিতীয় মানুষটি রইল না! কিন্তু তা কি পদ্মাবতীরই রইল?

একসময় কোনোভাবে শ্রাদ্ধশান্তিটা চুকে গেল। ঘরে যেটুকু যা গচ্ছিত ছিল, ছেলের আত্মার কল্যাণে তার সবটুকু ব্যয় করলেন পদ্মাবতী। অনন্তলাল আর আনন্দচন্দ্র পুরোহিত ডেকে সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। খবর পেয়ে বাউল দাসও আর নিজেকে আড়াল দিয়ে রাখতে পারলো না। গ্রামের সমাজ, সংস্কারের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এখানে জট পাকিয়ে আছে মানুষ। তাদের কাছে কোনো কিছু নিয়ে নিন্দে

রটলে ঘরে বাস করা কঠিন হবে পদ্মাবতীর পক্ষে। এ কথা জানতেন তিনি, জানতেন—যেদিন নিজে তিনি স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হলেন, সেদিন থেকে। আজ নিজে তিনি পুত্রহারা, আর বৌমা তার স্বামী-হারা। লোকের মুখের নিন্দে বন্ধ করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না তিনি কোনোদিকে। অনন্তলাল আর আনন্দচন্দ্র যতটুকু পারলেন, গায়ে খেটে দিয়ে গেলেন।

এমনি করেই এ-গৃহের শোকাচ্ছন্ন মুহূর্তগুলি একে একে কেটে যেতে লাগলো।

পাঁচ

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধ করি অন্যরকম ছিল। বাউল দাস লালনকে অন্তর্জলি ক'রে তার মুখে অগ্নি স্পর্শ ক'রে গেলেও লালনের প্রাণ কিন্তু সত্যি সত্যিই দেহত্যাগ ক'রে যায়নি। চৈতন্যলোক থেকে যে প্রাণ তার অন্তর্লোকের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, দেহের ক্রিয়াযন্ত্রে তাকে ধরতে পারেনি বাউল দাস। সংজ্ঞাহীন লালনকে সে তার ইচ্ছেমতো পরিত্যাগ ক'রে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছিল। যখন চৈতন্যলোকের আবরণ উন্মোচিত হয়ে একটু একটু ক'রে সংজ্ঞা ফিরে এলো লালনের, তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে গঙ্গার বুকে। অজানা নিস্তব্ধ পল্লী। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। গঙ্গার ঘাট তখন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। চারদিকে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ। কোথাও হয়তো একটা ডাহুক ডাকছে, একটু বাদেই শৃগালশ্রেণীর চিৎকারে কেঁপে উঠবে বনভূমি। একটু একটু ক'রে নিজের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে একবার কাতরোক্তি ক'রে উঠলো লালন: 'আঃ—, একটু জল, বড় তেষ্টা, একটু জল দে আমাকে কেউ।'

কিন্তু সে ডাকে যে সাড়া দেবার কেউ নেই, সেটুকু বুঝতে পারলো না লালন। সর্বাঙ্গে তার দারুণ ব্যথা, অন্ধের মতো দু'চোখ তার বন্ধ, বুকের নিচে প্রাণটা শুধু ধুক্ ধুক্ করছে। আর একবার সে কাতর-কণ্ঠে বললো, 'মা, মাগো, তুমি কোথায় মা, বড় তেষ্টা, একটু জল চাই, মা—'

ঠিক সেই মুহূর্তেই গ্রামের এক মধ্যবয়স্কা জোলা মহিলা কলসি কাঁখে জল নিতে আসছিল গঙ্গার ঘাটে। প্রতিদিন এমনি সময় এই ঘাট থেকে জল নিয়ে সে ঘরে ফেরে। নাম সাজেদা খাতুন। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পায়ে হাঁটা যে সরু পথটা এঁকে বেঁকে গ্রামের বুকে গিয়ে মিশেছে, সেখানে তার সংসার। বাইরে তাঁত-ঘরে কোনো-রকমে একখানি তাঁত চলে। তাই দিয়েই স্বামী-স্ত্রী দু'জনের দিন চলে যায়। আল-পথ ছেড়ে গঙ্গার ঘাটে নেমে আসতেই হঠাৎ তার কানে গিয়ে 'মা' ডাকটা বড় বাজলো। উৎকর্ণ হয়ে একবার চারদিকে তাকালো সে। এমন স্বরে কোনোদিন তো সে কাউকে 'মা' বলে ডাকতে শোনেনি এখানে। চিরকালের সন্তানহীনা সাজেদার মনে গিয়ে ডাকটা তাই বড় সাড়া তুললো। সন্ধ্যার ছায়া তখন আরও অনেকখানি গভীর হয়ে এসেছে। এবারে সেই আকুলস্বরে সাড়া দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘাটে নেমে এলো সাজেদা। জিজ্ঞেস করলো, 'কে, কে বাছা তুমি ?'

লালন শুধু বললো, 'একটু জল, বড় তেষ্টা—।'

এবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেই নিজের মধ্যে আঁৎকে উঠলো সাজেদা। বললো, 'এ কি ! এ তুমি যেই হও, কিন্তু এ কি অবস্থা তোমার ?'

লালনের দু'চোখ বেয়ে তখন ধারায় অশ্রু নেমে এসেছে ; গলা দিয়ে মনে হচ্ছে আর স্বর বেরোবে না। অতিকষ্টে আর একবার সে উচ্চারণ করলো, 'মা, মাগো—'

—'মা ? আমি তোমার মা ?' অস্থির আবেগে নিজের মধ্যে একবার উত্তাল হয়ে উঠলো সাজেদা। বললো, 'দেবো, জল দেবো, এই বুকে ক'রে তোমাকে সারিয়ে তুলবো। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে বোধ করি এ অবস্থায় ত্যাগ ক'রে আপনজন সব পালিয়েছে ! একটু অপেক্ষা করো বাবা, আমি এক্ষুনি তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবো।' বলে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না ক'রে ছুটতে ছুটতে নিজের স্বামী জহিরুল হককে সে এসে খবর দিয়ে নিল, তারপর অনেক কষ্টে দু'জনে ধরাধরি ক'রে লালনকে এনে তাঁতঘরের একপাশে কাঁথা পেতে শুইয়ে দিয়ে

মুখে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চেষ্টা করলো।

অনেক কষ্টে এবারে একবার চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করলো লালন, কিন্তু চোখের জ্যোতি এমন নয় যে, কিছু দেখতে পায়, শুধু আর একবার সেই একই কাতরকণ্ঠে সে উচ্চারণ করলো: 'মা, মাগো—।'

—'বাপজান, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার বলো?' লালনের শিয়রে বসে তার মুখের কাছে নিজের মুখখানি নামিয়ে এনে সাজেদা বললো, 'বলো, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার? আমি তোমার শিয়র ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা, তোমার সব কষ্ট আজ থেকে আমার; আমি যে মা!'

—'মা!' অস্ফুটকণ্ঠে শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে আর একবার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো লালনের।

এমনি করেই গোটা দুই রাত্রি কেটে গেল।

একসময় স্ত্রীকে আড়ালে পেয়ে জহিরুল বললো, 'এই দু'দিনেই মরা ছেলেটাকে তুমি দেখছি বাঁচিয়ে তুলেছ। কিন্তু এ দু'দিন তোমার নিজের দিকে কি একবারও তাকিয়ে দেখেছ, শরীরের কি হাল হয়েছে!'

স্বামীর চোখের দিকে নিজের কালি-পড়া চোখ দুটোকে দৃঢ় ক'রে সাজেদা বললো, 'আজ যদি তোমার নিজের ছেলে থাকতো, তবে, এতদিনে আমার শরীরের এ হালটুকুও থাকতো না।'

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জহিরুল বললো, 'তুমি সত্যিই মা সাজেদা, আশমানের মতো দিল তোমার, তোমার মাতৃত্বের তুলনা নেই। কিন্তু এদিকে যে তাঁত বন্ধ, খাবে কি?'

উত্তরে সাজেদা বললো, 'আমি দু'দিন না খেলে এ শরীরের কিছু হবে না, কিন্তু দোহাই তোমার, ছেলেটার পথ্যে যেন টান পড়ে না দেখো; তবে আর আমি বাঁচবো না।' বলে এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা না ক'রে পুনরায় এসে লালনের শিয়রে বসলো সাজেদা।...

ধীরে ধীরে গায়ের গুটি শুকিয়ে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলো লালন।

একে একে সমস্ত কথাই তার মনে পড়লো। ইচ্ছে হলো—এক্ষুনি সে ছুটে যায় নিজের বাড়িতে। সেখানে মা পদ্মাবতী আর দয়ার না জানি কত কষ্টে দিন যাচ্ছে! কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠলেও মাথা খাড়া করে বেশীক্ষণ বসতে পারলো না সে। দেহের নাড়িগুলো এরই মধ্যে কেমন যেন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে! মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো: 'আমাকে কোথা থেকে তোমার ঘরে তুলে নিয়ে এলে মা? সেখানে বাউল, কানাই বা ভরদ্বাজ কেউ ছিল না?'

—'না, কেউ না।' থেমে সাজেদা জিজ্ঞেস করলো, 'তারা কারা বাবা?'

—'আমার বন্ধু।' লালন বললো, 'ওদের সঙ্গেই তো নৌকোয় গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম বহরমপুরে। ফিরতি পথে বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। তারপর কি হলো, কোথায় আমি রইলাম, কোথায় ওরা গেল, কিচ্ছু জানিনে।'

মনে বড় লাগছিল সাজেদার। সেটুকু নিজের মধ্যে গোপন ক'রে নিয়ে বললো, 'জানলে বোধ করি তোমাকে আমি এমন ক'রে পেতাম না বাবা।'

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে লালন বললো, 'তোমাকে এমনি ক'রে পাবো বলেই তো এই হলো মা। তোমার কাছে যে আমাকে আসতেই হতো।'

শুনে বুকখানি এবারে ভরে গেল সাজেদার। অনেকক্ষণ শিয়রে বসে নীরবে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করলো সে লালনকে, তারপর একটুকাল কেটে গেলে নিজে থেকেই এবারে সে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়িতে তোমার কে আছে বাবা? কি বলে ডাকে তোমাকে সবাই?'

লালন বললো, 'থাকার মধ্যে আমার বিধবা মা, আর—আর আমার স্ত্রী। মা আমাকে লালন বলেই ডাকে, এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো নাম নেই।'

সাজেদার উজ্জ্বল মুখখানিকে হঠাৎ যেন কেমন দেখালো, বললো,

তুমি তবে বিয়ে করেছ, তোমার বউ আছে ?'

—'হ্যাঁ, আমার গর্ভধারিণী মা-ই আমাকে জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিল। কেবলই বলতো—সংসারে কবে আছি, কবে নেই, তুই যদি বিয়ে না করিস, তবে তোকে আমি কার হাতে রেখে যাবো লালন ? মার কথায় আমি আপত্তি করতে পারিনি।' থেমে লালন বললো, 'কতদিন তাদের ছেড়ে এসেছি, এসে যে আমার এমন মরণ হবে, কে জানতো ! ওদের গিয়ে চোখে না দেখতে পারা অবধি আমি শান্তি পাচ্ছি না মা।'

নিঃসন্তান সাজেদা লালনকে কাছে পেয়ে সন্তানের অভাব ভুলতে চাইলেও এ সংশয় তার মনে ছিল যে, পরের ছেলেকে হয়তো নিজের ক'রে চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না, তবু মমতা ত্যাগ করতে পারেনি সে। এ সংসারে একটি ছেলেও অন্তত তাকে মা বলে ডেকেছে, এ কি তার কম পাওয়া ? একটুকাল চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললো, 'যাবে বৈকি বাবা, নিজের ঘর-সংসারে নিজে যাবে না, সে কি হয়। ভালো ক'রে সেরে ওঠো, গায়ে একটু জোর হোক, তখন যেয়ো।'

গভীর আবেগে এবারে দু'হাতে সাজেদাকে আঁকড়ে ধ'রে লালন বললো, 'তুমি আমার সাক্ষাত ভগবতী মা, আমি যেন চিরকাল তোমার সেবা করে জীবনকে ধন্য করতে পারি।'

সাজেদার গলাটা বোধ করি ধ'রে এসেছিল, বললো, 'আমি আর কতকাল এ সংসারে, বয়স হয়েছে, খোদাতালার শেষ ডাকের জন্যে বসে আছি। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে জীবনে সুখী হও, তা হলেই আমি সুখী হবো বাবা।'

এর পর আরও দিন দুয়েক কেটে গেল।

একসময় বাইরের কাজ সেরে ঘরে এসে জহিরুল হক বললো, 'দরবেশ সিরাজ সাঁই এসেছেন আমাদের গাঁয়ে। এতকাল যশোর জেলার ফুলবাড়ি গাঁয়ে ছিলেন। তাঁর অশেষ দয়া যে, আমাদের এ গাঁয়ে তিনি পায়ের ধুলো দিলেন। এ তল্লাটে এতবড় সাধক ফকির

আর দ্বিতীয় নেই। যেমন সাধক, তেমনি আলাপী। পথে দেখা হতেই তিনি আমাদের বাড়িতে এসে উঠতে চাইলেন। তুমি বলো তো আমি গিয়ে নিয়ে আসি, এতক্ষণে হয়তো গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তিনি আসন পেতে বসেছেন!'

শুনে মনে বড় ভক্তির সঞ্চার হলো সাজেদার। বললো, 'আমি বলবো, তবে তুমি নিয়ে আসবে? লালনের এ অবস্থায় এ বাড়িতে ফকির বাবার পা পড়লে সব বিপদ কেটে যাবে। যাও, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে তুমি বাবাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস।'

জহিরুল হকের মনটাও ঠিক এই কথাই শুনতে চাচ্ছিল। এবারে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে সোজা ছুটে গিয়ে যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে সে সিরাজ সাঁইকে সঙ্গে ক'রে ঘরে নিয়ে এলো। সারা গায়ে জরাজীর্ণ আলখাল্লা, হাতে একটা লোহার চিমটে ও একতারা জাতীয় একটি যন্ত্র। সে যন্ত্রে সুর বাজে। সেই সুর তুলে আপন মনে গাইতে গাইতে ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো সিরাজ সাঁই—

'মন তোর দেহের ভাবনা কেন?
গুরুর নাম লয়ে তুই বস ধেয়ানে,
গাঁটের টাকা খরচ ক'রে
কেন গেলি তুই গঙ্গাস্নানে?…'

গানের কলি কানে যেতেই নিজের মধ্যে কেমন তন্ময় হয়ে গেল লালন। মনে হয়েছিল—গান বুঝি তার জীবন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু সুরের স্পর্শে আবার সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠলো তার মন। ফকিরের কণ্ঠে যেন তার মনের কথা ফুটে উঠেছে। অথচ সে-কথাটুকু সে কাউকে খুলে বলতে পারলো না।

সিরাজ সাঁইকে পরিচর্যার ত্রুটি রাখলো না সাজেদা। তারপর একসময় বললো, 'যমের দুয়ার থেকে আমার ছেলে ফিরে এসেছে। ও তো শীগগির শীগগির ভালো হয়ে উঠবে ফকির সাহেব?'

সিরাজ সাঁই জিজ্ঞেস করলো, 'কই, তোমার ছেলে কই, দেখি?'

এবারে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে লালনের শিয়রে এসে দাঁড়ালো সাজেদা।

একপাশে বসে পড়ে নিজের মধ্যে কেমন যেন একবার বিভোর হয়ে গেল সিরাজ সাঁই, তারপর লালনের বসন্তবিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, 'তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি, বলো তো ?'

তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে লালন বললো, 'আপনাকেও আমার খুব চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে নেই।'

—'তা হ'লে মনে মনেই আমাদের দেখা হয়েছে।' থেমে সিরাজ সাঁই বললো, 'এই বস্তুজগতের বাইরে মনোজগতেও আমরা অনেক সময় অনেকের সঙ্গেই মিশি, জড়দেহের বস্তুচেতনায় তা ধরা পড়ে না। তুমি আমার সেই মনোজগতের মানুষ গো! তা—শুয়ে কেন, উঠে বসো।'

ব্যস্তকণ্ঠে সাজেদা বললো, 'উঠে বসবে কি, এখনও যে ও শুধরে উঠতে পারেনি ফকির সাহেব!'

—'পেরেছে, পেরেছে।' স্মিতকণ্ঠে সিরাজ সাঁই বললো, 'যে মানুষ চিরকাল মনে শুধরে আছে, সে আবার নতুন ক'রে শুধরে উঠবে কি ? দেহ তো মনের অধীন, সে তো ভঙ্গুর, মন যে নিরেট!' বলে আপন মনে গেয়ে উঠলো সে—

খাড়া ভাঙনের উপর আছ রে মন বসে,
একাই ভাঙ্গিতে পারে ঢেউ লাগে যদি কষে।
ধর্ম-ডিঙ্গা বাঁধলি না রে মন,
জলে-প'লে বাঁচবি কিসে ?
যে বেঁধেছে ধর্ম-ডিঙ্গা তার
পারের ভাবনা কিসে ?

কেমন যেন সম্মোহিতের মতো এবারে ধীরে ধীরে উঠে বসলো লালন, বসে তেমনি অবাক বিস্ময়ে সিরাজ সাঁইয়ের মুখের দিকে

তাকিয়ে রইল।

গান থামিয়ে সিরাজ সাঁই বললো, 'কি গো, দেহের কি কিছু তাপ আছে, তাপ তো মনের! মনের মানুষ পেলে সেই মনও জুড়োয়। দিবানিশি মন যে তাই মুরশেদকে ডাকে, সাঁইকে ডাকে। তাই তো বলি—' বলে আর একবার সুর ধরলো সিরাজ সাঁই—

মনের মানুষ তালাস কর রে মন—,
তবে পাবে সেই রূপ দরশন।
মনের মধ্যে আর এক মন আছে,
সেই মনের গঠন আছে এই মনের সাথে।
ও ফুলের আগা কাটা, মাকরী ছাটা,
মধ্যে আছে মহাজন,
মনের মানুষ তালাস কর রে মন।

থেমে সিরাজ সাঁই বললো, 'দেখ তো মুরশেদকে দেখতে পাও কিনা। চোখে নয়, মনে, মনশ্চক্ষে! আমি যাই, এ গাঁয়ে যখন এলাম, গাঁয়ের মানুষগুলোর সঙ্গে একবার ভাব ক'রে আসি।'

সাজেদা বললো, 'আপনি জল-পানি কিছু মুখে দিয়ে বেরোবেন না ফকির সাহেব? আমার যে তবে পাপ হবে!'

—'তোমার পাপ হলে আমারই কি পুণ্য হবে!' সিরাজ সাঁই বললো, 'দাও, কি দেবে দাও। সবই তো আমার মুরশেদের প্রসাদ, ঘরে ঘরে প্রসাদ খেয়ে মুরশেদকেই বারবার আস্বাদ করি।'

—'আসুন আমার সঙ্গে, বলে এবারে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো সাজেদা সিরাজ সাঁইকে, তারপর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে বললো, 'লালন আমার ভালো হ'য়ে গেছে, তাই না ফকির সাহেব?'

উত্তরে সিরাজ সাঁই কেমন একটা নিরর্থক হাসি হেসে বললো, 'ভালো ক'রে তুললে, তা—ভালো হবে না? কিন্তু এত মায়া কেন মা, বলো তো? মায়া ক'রে ক'রে আমরা ইহকাল পরকাল দুইই হারাই। জন্মের পরই তো আমরা মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তাকেই তো পর বলে! সেই পরের জন্যে মায়া করতে নেই। সেই সময়টুকু মুরশেদকে

দান করলে জীবন মধুর হয়, প্রাণ আশ্বস্ত হয়।' ব'লে গুনগুন ক'রে আপন মনে আবার কি একটা গানের কলি ভাঁজলো সে।

সাজেদা সেদিকে কান না দিয়ে তার জলপানির ব্যবস্থায় কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।...

এরপর দু'টো রাত্রিও ভালো ক'রে কাটলো না।

একসময় লালন বললো, 'আমি তো এখন অনেকখানিই ভালো হয়ে উঠেছি, এবারে আমাকে বিদায় দাও মা। বাড়ির জন্যে মন বড় উতলা হয়েছে। আমি আবার আসবো, তোমাকে কখনো না দেখে কি আমি থাকতে পারি, আবার আসবো আমি। এবারের মতো তুমি আমাকে শুধু বিদায় দাও মা।'

মুহূর্তের জন্য একবার স্থির হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে চোখে জল এলো সাজেদার। বললো, 'আমি জানতাম—তোকে চিরকালের ক'রে পাবো না বাবা, তবু তোকে আমি ফেলতে পারিনি। তোর মুখের মা ডাক আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিল। তুই তোর নিজের ঘরে যাবি, আমি বাধা দেবো কি ক'রে? শুধু অনুরোধ, এ দু'চোখ বুজবার আগে আবার যেন আমাকে তুই দেখা দিস লালন। নইলে মরেও আমি শান্তি পাবো না।'

লালন বললো, 'ছিঃ, ও কি কথা মা! অমন ক'রে বললে আমি ঘরে গিয়েও যে তিষ্ঠোতে পারবো না! তুমি দেখে নিও, কত শীগ্‌গির এসে আমি তোমাকে দেখে যাই। এবারের মতো শুধু আমাকে বিদায় দাও মা।'

এ কথার জবাবে এবারে সাজেদা মুখ ফুটে কিছু একটাও বলতে পারলো না।

অলক্ষ্যে হঠাৎ উপুড় হয়ে সাজেদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো লালন।

বিচলিত কণ্ঠে সাজেদা বললো, 'ছিঃ, এ কি করলি বাবা? হিঁদু ঘরের ছেলে তুই, তুই আমার পা ছুঁলি?'

শান্ত কণ্ঠে লালন বললো, 'ছেলে মায়ের পা ছোঁবে না তো কে ছোঁবে মা?'

শুনে সাজেদার মনের মধ্যেটা যে কি ক'রে উঠলো, তা একমাত্র সে ভিন্ন আর কেউ জানলো না। লালনকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে অনেকক্ষণ সে নীরবে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করলো।

কিন্তু কেন এই অশ্রু, তা লালনও বুঝলো না। একসময় ঘর ছেড়ে সে পথে এসে দাঁড়ালো, তারপর গঙ্গার ঘাটে এসে একখানি যাত্রী-বাহী নৌকো পেয়ে তাতে উঠে পড়লো।

ছয়

গভীর শোকের মধ্যেই কোনভাবে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল পদ্মাবতী আর দয়ার। সমাজের অনুশাসন আছে, কিন্তু সমাধান নেই; লোক-লজ্জার ভয় আছে, কিন্তু সাহায্যকারী নেই। এই অবস্থার মধ্যেই পুত্রবধূকে নিয়ে দুঃখের সংসারে শোকের ভেলা ভাসিয়ে কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন পদ্মাবতী। ইতিমধ্যে হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যারাতে বহির্বাটিতে লালনের কণ্ঠস্বর শুনে নিজের মধ্যে চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি। এ কি সম্ভব, এ কি কখনও হ'তে পারে? যে ছেলের মৃত্যু সম্পর্কে কোনো মিথ্যে নেই, যার শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত হয়ে গেল, সে কি আর কখনও জড় দেহের রূপ নিয়ে এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে? এ তাঁর মনের ভুল। এমন ভুল ক'রে কত সময়ই তো লালনের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পান। জপের মালা হাতে নিয়ে একবার স্থির হয়ে বসলেন পদ্মাবতী।

সেই মুহূর্তে আর একবার লালনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।—'মা, মা তুমি কোথায়?'

—'এই যে বাবা, এই তো আমি ঘরেই আছি।' বলতে গিয়ে বুকের ভিতরটা দ্রুত একবার আন্দোলিত হয়ে উঠলো পদ্মাবতীর। এ আজ কি হ'লো তাঁর? যা মিথ্যে, যা অলীক, যার পিছনে সত্য বলে কিছু নেই, তা নিয়ে হঠাৎ তিনি এমন উতলা হয়ে উঠলেন কেন?

পাশের ঘর থেকে দয়া একবার গলা ছেড়ে বললো, 'মা কি শুয়ে আছেন, না বসে আহ্নিক করছেন?'

পদ্মাবতী উচ্চগ্রামে গলা তুলে বললেন, 'বসেই আছি মা, শুয়ে কি এ পোড়া দু'চোখে ঘুম আসে?'

ঘুম দয়ার চোখেও ছিল না। উপরন্তু সে লালনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। শুনে কেমন একটা ভয়ে সারা গা তার ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠছিল। সেটুকু ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় শাশুড়ির উদ্দেশে তাই গলা তুলেছিল সে। সাড়া পেয়ে এবারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

ইতিমধ্যে বাইরের দাওয়ার প্রায় কাছাকাছি এসে আর একবার লালনের কণ্ঠ উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো: 'আমি ফিরে এসেছি মা, তোমার লালন; দরজা খুলে একবার প্রদীপটা হাতে উঁচিয়ে ধরো না, বড্ড অন্ধকার বাইরে।'

এবারে পদ্মাবতী কিছু একটা বলবার আগেই নিজের ঘর থেকে এক দৌড়ে ছুটে এসে কাঁপতে কাঁপতে শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে দয়া ব'লে উঠলো: 'শুনতে পেয়েছেন, কার গলার স্বর, শুনতে পেয়েছেন মা?'

—'তুমিও তবে শুনেছ বৌমা?' কাঁপা গলায় পদ্মাবতী বললেন, 'আমি তবে ভুল শুনিনি, আমার লালন ফিরে এসেছে। ওরা মিথ্যে কথা বলে এতকাল আমাদের কাঁদিয়েছে। আমার লালন কি অমনি ক'রে কখনও অপঘাতে মরতে পারে? প্রদীপটা একবার তুলে ধরো বৌমা, বাইরে বড্ড অন্ধকার।' বলতে বলতে নিজেই এবারে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন পদ্মাবতী, বললেন, 'কই বাবা, তুই কোথায় লালন?'

—'এই তো আমি এসেছি মা।' ছুটে এসে মাকে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে লালন বললো, 'আমার ফিরে আসতে বড় দেরী হয়ে গেল, তাই না? যদি সব কথা শোনো, তবে আমার উপর তোমার একটুও রাগ থাকবে না।'

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ভাবাবেগে অশ্রু বিসর্জন ক'রে পদ্মাবতী

বললেন, 'না, না, না, তোর উপর আমার কোনো রাগ নেই, একটুও রাগ করিনি আমি তোর উপর। যেখান থেকে কেউ কোনোদিন ফেরে না, তুই যে সেখান থেকে আমার বুকে ফিরে আসতে পারলি, তাতেই যে আমার বুক ভরে গেছে বাবা!'

বসতে বসতে লালন বললো, 'কোথা থেকে কেউ কোনোদিন ফিরে আসে না মা? গঙ্গা থেকে?'

—'হয়তো তাই হবে। সে কথা থাক।' ব'লে এতক্ষণে লালনের মুখের দিকে একবার ভালো ক'রে তাকাতে যেতেই আর একবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন পদ্মাবতী। বললেন, 'এ আজ কি চেহারা নিয়ে তুই ফিরে এলি বাবা, এ যে আজ তোকে তুই বলে চিনবার পথটুকুও রাখিসনি!'

লালন এসে ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে দয়া শাশুড়িকে ছেড়ে মুখের উপর দিয়ে ঘোমটা টেনে একপাশে গিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

মায়ের কথার জবাবে লালন বললো, 'আসার পথে মায়ের দয়া হলো, রোগ-যন্ত্রণায় বেহুঁস হয়ে পড়লাম। বাউল ওরা তাই দেখে বোধ করি ভয় পেয়ে পালালো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তোমাকে ডাকতেই কাছে পেলাম এক নতুন মাকে। তিনিই আমাকে সারিয়ে তুললেন। মাথা তুলে বসতে পেরে একটা দিনও আর দেরী করিনি, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম। গৌরীর ঘাটে দেখলাম দু'একজন আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকালো, বোধ করি অন্ধকারে ভালো ক'রে চিনতে পারেনি। আমিও আর আলাপের সূত্রে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলাম না।'

শুনতে শুনতে এতক্ষণ দু'চোখ দিয়ে অঝোরধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিল পদ্মাবতীর। সে জল দয়ার চোখেও কম প্রবাহিত হচ্ছিল না। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে দেখবার অবকাশ ছিল না পদ্মাবতীর। বললেন, 'বেশ করেছিস বাবা। এবারে তুই শুয়ে একটু সুস্থ হ দিকি, আমি তোর জন্যে খাবার তৈরি ক'রে আনি।'

লালন বললো, 'এই রাত ক'রে তুমি কেন কষ্ট করবে মা, সেজন্যে

তোমার বউই তো রয়েছে!' ব'লে অপাঙ্গে একবার গৃহকোণে অবগুণ্ঠিতা দয়ার দিকে তাকাতেই মনটা যেন হঠাৎ কেমন ক'রে উঠলো লালনের! দয়ার পরিধানে সাধারণ আটপৌরে থান, নগ্ন দেহকে সেই থানে জড়িয়ে তপস্বিনীর মতো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দয়া। লালন বললো, 'তোমার বউ বুঝি আজকাল নিজের শাড়ি রেখে তোমার থান পরতে শুরু করেছে? কেন, ওর শাড়ি সব এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে?'

কথাটা কানে যেতেই এবারে নিজের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠলো দয়া।

কান্নায় পদ্মাবতীর দু'চোখও ভেসে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে পুনরায় লালন বললো, 'তোমরা এমনি ক'রে কাঁদছো কেন, বলো তো মা? এমন কি ঘটেছে—যা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!'

—'ঘটনার কিছুই যে বাকি নেই বাবা!' পদ্মাবতী বললেন, 'সে কথা মা হ'য়ে আমি কোন্ মুখে তোকে খুলে বলি?'

—'কেন, এমন কি কথা মা, যা তুমি আমাকে বলতে পারছো না?'

এবারে কথা চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে পদ্মাবতী বললেন, 'আগে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হ তো!' বলে প্রদীপ থেকে একটা রেড়ির তেলের ঢিবরি ধরিয়ে নিয়ে হবিষ্যঘরেব দিকে পা বাড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে দয়াও দ্রুত পায়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

হাতে হাতে খাবার তৈরি ক'রে নিতে বেশিক্ষণ লাগলো না দু-জনের। পদ্মাবতী বললেন, 'আটা ছেনে তুমি বরং খানকতক রুটি বেলে দাও বৌমা, আমি ততক্ষণে নারকেলের পাতা দিয়ে উনুন জ্বেলে একপদ তরকারী নামিয়ে নিই। তার সঙ্গে নারকেল কোরা দিয়ে এবেলার মতো কোনোরকমে চলে যাবে লালনের। জানো না তো, তুমি এ সংসারে আসার আগে প্রায়ই ও আমার সঙ্গে হবিষ্য করতো। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সেই ছোটবেলা থেকে কোনোদিন ওর মুখে কোনো কথা নেই। দাও, তুমি বরং হাত চালিয়ে খানকতক রুটি বেলে দাও।'

হবিষ্যি ঘরেই হাঁড়িতে আটা ছিল, নামিয়ে নিয়ে জল মিশিয়ে মেখে নিল দয়া।

উনুনে আগুন দিয়ে বৌমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে চাপাকণ্ঠে পদ্মাবতী বললেন, 'আমাদের সংসারে এমনি ক'রে আগুন লাগিয়ে বাউল যে কি আনন্দ পেলো, বুঝলাম না। হয়তো শরীরের গ্লানিতে পথে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল লালন, মৃত ভেবে ওরা ওদের নিজেদের কাজ সেরে ফিরে এসেছিল!'

দয়ার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, শুধু একবার অশ্রুম্লান মুখখানিকে শাশুড়ির মুখের দিকে তুলে ধরে পুনরায় নামিয়ে নিল সে।···

এমনি ক'রেই একসময় লালনের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে নিজের ঘরে এসে একবার ঘুরে গেল সে। দয়া এ সময়ে ঘরেই ছিল। মনে হলো—এতক্ষণে সে চোখের সামনে ভূত দেখেছে। ভূত ভিন্ন কি? প্রেতলোক থেকে যে সন্থ উঠে এসেছে, সে ভূত ভিন্ন কি! বাইরের দরজায় তার কণ্ঠস্বর শুনে ভূত মনে ক'রেই ভয়ে সে দৌড়ে গিয়ে শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরেছিল। এখনও সে স্বামীকে ভূত ভিন্ন কিছু একটা ভাবতে পারছে না।

লালন বললো, 'কি গো, এত দিন বাদে এলাম, একটি বারও তো ভালো ক'রে মুখের দিকে তাকালে না? জানি, এ মুখের দিকে তাকাতে তোমার ভয় করবে। মায়ের দয়ায় এ দেহের আর কিছু নেই।'

এবারে স্বামীর মুখের দিকে একবার ভালো ক'রে তাকাতে গিয়ে সহসা হু'হাতে চোখ ঢেকে পুনরায় ডুকরে কেঁদে উঠলো দয়া।

লালন বললো 'তোমাদের এই কান্নার তাৎপর্যটা কিন্তু এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না! ব্যাপারটা কি, খুলে বলো দিকি? তাছাড়া নিজের শাড়ি ফেলে এমনি ক'রে মায়ের থান প'রেই বা আছো কেন? বলি, আমি কি মরেছি যে, থান পরবে?'

হু'হাতে এবারে নিজের কান হু'টোকে চেপে ধরলো দয়া, তারপর

আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে শুধু বললো, 'নইলে কপালের সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা ভাঙতে হলো কেন আমাকে ? কেন—'

আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলো না দয়া, মেঝের এক পাশে বসে পড়ে তেমনি ক'রেই সে কাঁদতে লাগলো।

সহসা বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো লালনের। এতটুকুও আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত সে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি তা হলে তোমাদের কাছে মৃত ? তোমার বৌমা তা হলে বিধবা হয়েছে ? আমার শ্রাদ্ধটাও বোধ করি তবে করতে বাকি নেই ? কি, কিছু বলছো না যে মা ?'

—'লালন !' দুঃখে শোকে ব্যথায় বেদনায় যে কণ্ঠ এতদিন ম্রিয়মাণ হয়ে ছিল, পদ্মাবতীর সেই কণ্ঠ হঠাৎ আর একটা গভীর আঘাতে আর্তনাদ ক'রে উঠলো : 'ও-কথা মুখে আনিস নে বাবা, ও-কথা আমি সইতে পারবো না। আমার কাছে এসে বস লালন, আমি সব তোকে খুলে বলবো। তোকে ফিরে পেয়েছি, আমার যে আর কোনো ভয়, কোনো দুঃখ নেই। আয়, আমার বুকে মাথা রেখে একটুকাল বস দিকি !'

মায়ের সামনে এসে এবারে ব'সে পড়লো লালন। বললো, 'বলো, আগে সব কথা খুলে বলো, বলো—কী এমন ঘটেছে এখানে—যার জন্যে এমনি করছো তোমরা ?'

কোনো কিছু না লুকিয়ে পদ্মাবতী এবারে একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বললেন, 'ওদের সঙ্গে এমনি ক'রে তোকে গঙ্গাস্নানে যেতে দিতে আমার যে সেদিন মন চায়নি লালন! এতদিন উঠতে-বসতে কেবল ভগবানকে ডেকেছি, তিনি দয়াময়, দয়া ক'রে তিনি তোকে আজ আমার বুকে ফিরিয়ে এনে দিলেন।'

দুঃখে মুখ ফুটে কথা আসছিল না লালনের, তবু জোর ক'রে বললো, 'বাউস ওরা এভাবে আমাকে ত্যাগ ক'রে আসবে জানলে আমিই কি যেতাম ওদের সঙ্গে ? তোমার পায়ের ধুলোর চাইতেও কি আমার কাছে গঙ্গাস্নান বেশী পবিত্র মা ? অথচ অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস

যে, বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করলেও তোমার মতো আর এক মা আমাকে দিনরাত শুশ্রূষা ক'রে ভালো ক'রে তুললো। আমাদের চাইতেও গরীব তারা, জাতে জোলা, কিন্তু সে বোধ করি বামুনের চাইতেও উঁচু! আমার জীবনদায়িনী সেই মা আর তুমি আমার কাছে আজ এক হয়ে গেছ মা।'

চিরকালের সংস্কারে গিয়ে বোধ করি একবার ঘা লাগলো পদ্মাবতীর। বললেন, 'জোলার ঘরে তবে তুই অন্নপথ্য করেছিস? এ-কথা যেন এখানে কাউকে বলিস নে লালন, তবে আমাদের একঘরে ক'রে রাখবে সবাই।'

লালনের কণ্ঠে এবারে কিছুটা উত্তেজনা ফুটে উঠলো, বললো, 'আর যারা ঘটা ক'রে আমার মৃত্যুসংবাদটা এসে শুনিয়ে গেল, তাদের অবস্থাটা কি হবে?'

চোখ দু'টোকে দৃঢ় ক'রে এবারে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন পদ্মাবতী, তারপর বললেন, 'তারা চিরকাল সমাজের বুকে মাথা উঁচু ক'রেই থাকবে। এই চিরকালের রীতি।'

—'কাল সকালেই বাউল ওদের ডেকে এনে সে-রীতি আমি কেমন ক'রে ভেঙে দিই, দেখ মা।'

কিন্তু সকালে উঠে লালনের সে চেষ্টার আগে গ্রামের লোক দলে দলে এসে ভেঙে পড়লো তার বাড়ির উঠোনে। কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি কথাটা। গৌরীর ঘাটে কাল যারা অস্পষ্টভাবে লালনকে দেখেছিল, তারাই কোথায় একসময় ব্যাপারটা রটিয়েছিল। তাতেই কাজ হলো। কাজ হলো সন্দেহ নেই, কিন্তু উঠোনে এসে ভিড় ক'রে লালনকে স্বচক্ষে দেখেও কেউ বিশ্বাস করতে পারলো না যে, সে এখনও জীবিত। এ যেন আর এক মানুষ, বসন্তের ক্ষতে এ যেন অন্য কোনো বিকৃত চেহারার মানুষ, অথবা লালনের অশরীরী প্রেত। সাহস ক'রে তাই কেউ একা আসেনি, দল-বেঁধে এসেছে, পাছে ভয় পায়।

পদ্মাবতী তাদের বুঝিয়ে বললেন, 'রক্তমাংসের মানুষকে তোমরা প্রেত বলেই তো চিরকাল ভয় ক'রে এসেছ। কি ক'রে বুঝিয়ে বলবো

যে, আমি আমার লালনকেই ফিরে পেয়েছি, আর কাউকে নয়।'

কে একজন এবারে বলে উঠলো, 'বলো তো তবে আমরা এখানে কে কে এসেছি?'

লালন বললো, 'একথা আমি কেন, আমার প্রেতও বলতে পারতো। তুমি তো যজমানী বামুন নকুল গোঁসাই, তাছাড়া হেরম্ব ভট্চায, হিদারাম গুড়, যাদব মৃধা, দীনু কৈবর্ত, তোমাদের না চিনি কবে? কোনোদিন এ দুয়ারে তোমাদের পা পড়েনি, আজ না হয় আমার প্রেত দেখতে বাড়ি বয়ে এলে!'

এবারে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করলো সকলে।

খবর পেয়ে বাউল, কানাই আর ভরদ্বাজও ছুটে এসেছিল। ব্যাপারটা তাদের কাছে আরও বিস্ময়কর ছিল। যাকে নিজের হাতে বাউল দাস মুখাগ্নি ক'রে অন্তর্জলি ক'রে রেখে এসেছিল, হঠাৎ সে পুনর্জন্ম লাভ ক'রে ফিরে এলো কি ক'রে?

এসে দাঁড়াতেই তাদের উদ্দেশে গলা ছেড়ে লালন বললো, 'আমার শ্রাদ্ধের চিঁড়ে-দই তো তোরা শুনলাম বাদ দিস্‌নি কেউ, আর কি খাবি বল্, মাধব ঘোষের দোকানে গিয়ে তবে বলে আসি।'

পদ্মাবতী এতক্ষণ পাশেই অর্ধ-অবগুণ্ঠনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, 'ছিঃ, ওকথা বললে ওরা দুঃখ পাবে, সবাইকে বসতে দিয়ে তুই বরং ধীরে-সুস্থে গল্প কর বাবা।'

এতক্ষণে লালনকে লালন বলে চিনতে কারুর আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু শাস্ত্রগত হিন্দুমতে গৃহে তার এই উপস্থিতিকে স্বীকার ক'রে নিতে বাধলো।

নকুল গোঁসাই বললো, 'না না না, বসতে দিলেও যে আমরা বসতে পারবো না! যে মৃতের একবার পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সে যদি পুনর্জীবনও লাভ করে, তবু গৃহবাসের সে অধিকারী নয়। সুতরাং লালন যে গৃহী হয়ে সমাজে বাস করবে, তা চলবে না।'

শুনে পদ্মাবতীর সমস্ত শরীরটা একবার থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

বললেন, 'এ আপনি কি বলছেন গোঁসাই ঠাকুর ? এত ক'রে আমার ছেলেকে ফিরে পেলাম, তার কিনা গৃহে স্থান নেই ?'

—'এ আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা।' নকুল গোঁসাই বললো, 'সমাজে বাস ক'রে শাস্ত্র মানবেন না, তা কি চলে ? লালনকে সংসার ত্যাগ করতেই হবে।'

লালন বললো, 'এই তবে আমাদের হিন্দু সমাজ ?'

হেরম্ব ভট্চায বললো, 'হিন্দু হয়ে তোমার সমাজটা কী, তা হলে এতকাল জানোনি ?'

—'না, এমন করে জানিনি।' লালন বললো, 'আপনাদের কথা থেকে মনে হচ্ছে—এই কেবল আমি নতুন একটা সমাজে প্রবেশ করছি —যে সমাজে গর্ভধারিণী মা আর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাস করার অধিকার নেই।'

নকুল গোঁসাই বললো, 'এটা ব্যঙ্গের কথা নয়, এ হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। সে নির্দেশ মেনে না চললে তোমাদের বাড়িতে কেউ জলস্পর্শ করবে না, কেউ ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না।'

মাথার উপর থেকে অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসারিত ক'রে পদ্মাবতী বললেন, 'কি বললেন, কি বললেন গোঁসাই ঠাকুর, আমাদের তবে একঘরে হয়ে থাকতে হবে ? ছেলে তার নিজের বাড়িতে থাকতে পারবে না, এই কি শাস্ত্রের নির্দেশ ?' অশ্রুতে দু'চোখ ভরে গেল পদ্মাবতীর।

নকুল গোঁসাই বললো, 'আমরা সবাই যে শাস্ত্রের অধীন ! এ কোনো ব্যক্তির কথা নয়, এ হচ্ছে অপৌরুষেয় বিধান। এ বিধান যে মানতেই হবে !'

ঘরের ভিতরে বসে দয়া এতক্ষণ সব কথাই শুনছিল, শুনছিল আর দুঃখে সারা বুক তার ভেঙে যাচ্ছিল। অথচ নিজে উদ্যোগী হয়ে কাউকে যে কোনো কথা বলবে, এমন সুযোগ ছিল না তার। স্বামীকে ফিরে পেয়েও সে কাছে পাবে না, তার মতো হতভাগিনী সংসারে আর কে আছে ? নীরবে বসে বসে কেঁদে সে বুক ভাসালো।

নকুল গোঁসাইর কথার জবাবে এবারে ব্যাকুলকণ্ঠে পদ্মাবতী

বললেন, 'তা হলে এর কি কোনো প্রতিকারই নেই গোঁসাই ঠাকুর ? আমার লালনকে বুকে পেয়েও তবে কি আমাকে ত্যাগ করতে হবে ? আপনি আছেন, ভট্‌চায মশাই আছেন, পারেন না কি আপনারা এর কোনো প্রতিকারের বিধান দিতে ?'

নকুল গোঁসাই এবারে কি মনে ক'রে একেবারে হেরম্ব ভট্‌চাযের মুখের দিকে তাকালো। হেরম্ব ভট্‌চায বললো, 'প্রতিকার যে নেই, তা নয়, তবে তা এত ব্যয়সাধ্য যে, আপনার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

উতলাকণ্ঠে পদ্মাবতী বললেন, 'কি এমন ব্যয়সাধ্য যা আমি পারবো না ? আমার লালনের জন্যে আমি সব পারবো, আমার জীবন অবধি দিতে পারবো। কি এমন প্রতিকার আছে, বলুন গোঁসাই ঠাকুর ?'

নকুল গোঁসাই বললো, 'শাস্ত্রে আছে—মিষ্টান্নমিতরেজনা। যদি সমস্ত গ্রামকে নেমন্তন্ন ক'রে মিষ্টান্নভোজে পরিতৃপ্ত করতে পারেন, তবে সেই পুণ্যার্জনের দ্বারা পাপ স্খালন হতে পারে। এ ছাড়া নান্যপন্থা।'

কিন্তু পদ্মাবতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, একটি মানুষকেও নিমন্ত্রণ ক'রে পরিতৃপ্ত করতে পারেন। নিজের বলতে তাঁর যা কিছু ছিল, লালনের পারলৌকিক কাজে তার শেষ কপর্দক অবধি ব্যয় করেছেন। আজ একেবারে অনাথিনী তিনি। এতবড় বিধানটাই বা তিনি পালন করবেন কি ক'রে ?

লালন এবারে আর স্থির থাকতে না পেরে ব'লে উঠলো, 'যে সমাজে মানুষের জীবনের চাইতে শাস্ত্রটাই বড়, সে সমাজের লোক-গুলোকে নিজেদের ঘরে ডেকে এঁনে পেট ভরে মিষ্টান্ন খাওয়াতে হবে ? এর চাইতে সমাজ ত্যাগ করাও যে মঙ্গল। তুমি দুঃখ পেয়ো না মা, তোমাকে কোনো কিছু নিয়ে ব্যাকুল হতে হবে না, আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবু গোঁসাই ঠাকুর আর ভট্‌চায মশাইরা জেনে নিশ্চিন্ত হোক্ যে, তাদের অমূল্য বিধান অন্ততঃ এ গাঁয়ের একটি

পরিবার ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

নকুল গোঁসাই আর হেরম্ব ভট্‌চায এবারে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমাদের তুমি অপমান করতে চাও লালন, কিন্তু এ অপমান আমরা সইলেও গাঁয়ের লোক সইবে না। সমাজে এখনও ব্রাহ্মণের সম্মান আছে, ব্রাহ্মণের সে-সম্মান গাঁয়ের লোক রাখবে।'

লালন বললো, 'তোমাদের সে-সম্মানের অতুল ঐশ্বর্য তোমরা মহাশান্তিতে ভোগ করো, আমাদের কিছু বলবার নেই! দয়া ক'রে এবারে তোমরা নিজেদের কাজে যেতে পারো। গাঁয়ে বাস ক'রে আমার মা কিংবা স্ত্রীর কোনোরকম অমর্যাদা হয়, তা আমি হতে দেবো না। আমি তো বলেছি, আমি গৃহত্যাগ করছি। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে যেতে পারো।'

পদ্মাবতী এবারে আছড়ে পড়লেন, বললেন, 'এ তুই কি করলি লালন? তুই না থাকলে আমরা তবে কি নিয়ে থাকবো বাবা? এ তুই কি করলি, কি করলি লালন?'

লালন বললো, 'ছিঃ, উতলা হয়ো না মা। যে সমাজ মানুষ চেনে না, চেনে শাস্ত্র, ধর্ম মানে না, মানে গোঁড়ামি, সে সমাজ উৎসন্নে যাক মা, সে সমাজ দিয়ে আমার কোনো কাজ নেই। শুধু তোমাদের জন্যে চিন্তা; তা—তোমাকে অন্ততঃ আনন্দদা আর অনন্তদা এসে এসে দেখাশোনা করতে পারবে; তোমার বউমাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ—সে কি তোমার কাছে থাকবে, না আমার সঙ্গে যাবে?'

নকুল গোঁসাই প্রভৃতি ততক্ষণে একে একে সরে পড়েছিল।

কাঁদতে কাঁদতে পদ্মাবতী বললেন, 'বউমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার আজ আর আমার মুখ নেই বাবা। ও আমি পারবো না।'

—'বেশ, আমিই জিজ্ঞেস করছি। বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেতেই ভিতর থেকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সেই বন্ধ দরজার ভিতর থেকে কান্নাভাঙা কণ্ঠে দয়া চিৎকার ক'রে বলে উঠলো, 'আমি যাবো না, এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না, মাকে ছেড়ে আমি এক পা-ও কোথাও যাবো না।'

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে লালন বললো, 'বেশ, মাকে নিয়েই তুমি থাকো, আমি তাতে অন্ততঃ এটুকু শান্তি পাবো যে, এ সংসারে মা একা নয়, তাঁকে দেখার জন্যে একটি প্রাণীও অন্তত আছে।' তারপর মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললো, 'আমাকে তুমি বিদায় দাও মা, চিরদিনের জন্যে বিদায়। যদি পারি তো তোমার খোঁজ নেবো, আর না পারি তো মনে কোরো—আমাদের সমাজ আর শাস্ত্র তোমার মরা ছেলেকে আবার মেরেছে।' বলে এক-মুহূর্তও আর অপেক্ষা না ক'রে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল লালন।

পদ্মাবতীর বুকফাটা চিৎকারে তখন সারা আকাশ মন্থর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর চোখের জল মুছে দেবার জন্যে আজ আর সংসারে কেউ রইল না।

সাত

ঝড়ের মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেলে আকাশের যে অবস্থা হয়, পথে এসে লালনের মনটাও তেমনি হয়েছিল। কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল! অথচ একটা দিন আগে অবধি তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারেনি সে। যে সমাজে বাস ক'রে যার ধর্ম ও দর্শনকে সে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিল, সে সমাজে আজ এতদিন বাদে সে তাকিয়ে দেখলো—তার নিজের কোনো স্থান নেই; সেখানে যারা বাস করে, তারা সবাই নকুল গোঁসাই, হেরম্ব ভট্‌চায আর হিদারাম গুড়ের মতো মানুষ। মা ঠিক কথাই বলেছিলেন, 'তারা চিরকাল সমাজের বুকে মাথা উঁচু ক'রেই থাকবে। এই চিরকালের রীতি।' ধিক্, শত ধিক্ সেই সমাজকে। কিন্তু মা আর দয়া? তাদের যে সেই সমাজেই থাকতে হলো! সেখান থেকে তাদের সরিয়ে আনতে পারলো না লালন। সরিয়ে আনবার বোধ করি জায়গা নেই এ পৃথিবীতে! ধর্ম তাদের রক্ষা করবেন।

ভাবতে ভাবতে পথের অনেকখানি এগিয়ে এলো লালন। আসতে গিয়ে তার শখের ঘোড়াটার কথা একবার মনে পড়লো। ঘোড়ায়

চড়বার শখ ছিল ব'লে একসময় অনেক কষ্টে একটা ঘোড়া কিনে এনেছিল সে, আদর ক'রে নাম রেখেছিল মাতব্বর। দূরে কোথাও কাজে বেরোতে হলে মাতব্বরই তাকে পিঠে ক'রে বয়ে নিয়ে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে সেই মাতব্বরকেও তার শ্রাদ্ধে দান ক'রে দিয়েছেন মা। নইলে এই অবসন্ন দেহটাকে আর একবার মাতব্বরের পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারতো সে। ভাবতে ভাবতে নিজের অলক্ষ্যেই কখন গৌরীর ঘাটে এসে একসময় আবার নৌকোয় চেপে বসলো সে, তারপর নিজের অলক্ষ্যেই মনের দুঃখে গান ধরলো—

দিনে দিনে হল আমার দিন-আখেরি।
আমি কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম
সদাই ভেবে মরি!
বসত করি দিবারাতে
ষোলজন বোম্বেটের সাথে,
তারা যেতে দেয় না সরল পথে
পদে পদে করে দাগাদারী।
বাল্যকাল খেলায় গেল,
যৌবনে কলঙ্ক হ'ল,
বৃদ্ধকাল সামনে এলো
আমার মহাকালে করলো অধিকারী।
যে আশাতে ভবে আসা,
তাতে হ'ল ভগ্ন দশা,
লালন বলে হায় কি দশা!
আমার উজাইতে ভেটেন পাল তরী।...

গৌরী ছেড়ে নৌকো একসময় পাবনার গা ঘেঁসে বহরমপুরের কাছাকাছি গঙ্গার ঘাটে এসে পৌছালো। এই ঘাট থেকেই সাজেদা খাতুন তাকে তার নিজের ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ঘাটে নেমে একদণ্ড আর অপেক্ষা না ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে সে সাজেদার সামনে বসে পড়লো, বললো, 'দেখলে তো মা, তোমাকে না দেখে

একটা দিনও আমি থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম।'

আনন্দে খুশীতে দু'হাতে লালনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সাজেদা বললো, 'আমি জানতাম তুমি আসবে ; তোমার মতো ছেলে মিছে কথা বলে আমার মতো অভাগিনীকে কখনও কাঁদাতে পারে না। তা—তোমার মা আর বউ ভালো আছে তো ?'

—'আছে, আছে মা, খুব ভালো আছে তারা।' লালন বললো, 'সমাজের পুরুতঠাকুরদের কল্যাণে তারা কি কখনও খারাপ থাকতে পারে মা ? শুধু আমি ভালো থাকতে পারলুম না, তাই প্রাণ নিয়ে ছুটে এলাম।'

কথাটা ভালো ক'রে বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো সাজেদা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ভালো থাকতে পারলে না তুমি, বাপজান ?'

লালন বললো, 'সে আমার অদৃষ্ট। অদৃষ্টের লিখন কেউ কোনো-দিন খণ্ডাতে পারে না মা। চাপড়া-ভাঁড়ারার সমাজে আমার আর ঠাঁই নেই, গ্রাম ছেড়ে তাই চলে এলাম।'

সাজেদা বললো, 'চলে এলে বলেই তো তোমাকে আবার আমি পেলেম বাবা ! আজ থেকে আমার এই কুঁড়েঘর তোমার।'

—'না মা, ঘরে আর আমাকে টেনো না, আমার ঘর যখন একবার ভেঙেছে, তখন ঘরের মায়ায় আমি আর বাঁধা পড়তে চাই না। পথই আমার ভালো। পথে পথেই ঘুরবো, মাঝে মাঝে এসে এমনি ক'রে তোমার স্নেহ কুড়িয়ে নিয়ে যাবো।'

এতক্ষণে খুশীতে-ভরা মুখখানি এবারে একমুহূর্তে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো সাজেদার, বললো, 'তবে কেন এমনি ক'রে এসে আমাকে আবার দেখা দিলি বাপজান ? এ বুকে আমার যে কত দুঃখ, তা যদি জানতিস, তবে এমনি ক'র চলে যেতে চাইতিস না।' বলতে গিয়ে গলাটা কেমন ধরে এলো সাজেদার !

লালন বললো, 'মনের মধ্যে আজ আমার দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে মা। পাছে সে-আগুনের স্পর্শে তোমাকেও পুড়িয়ে মারি, তাই

বড় ভয়। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে তুমি বাঁধতে চেয়ো না। তুমি আমার চিরকালের মা হয়ে রইলে, তোমাকে কি কখনও ভুলতে পারি? তোমার স্নেহ কুড়িয়ে নিতে আমাকে যে তোমার কাছে ছুটে আসতেই হবে।'

উত্তরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল সাজেদা, ইতিমধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো জহিরুল, বললো, 'এ ক'দিন ভেবে ভেবে কি অস্থিরই না হয়েছো, আবার ফিরে পেলে তো তোমার ছেলেকে!'

কিন্তু সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে সাশ্রুনেত্রে স্বামীর পাশ কাটিয়ে কোথায় একদিকে উঠে গেল সাজেদা।

বড় অবাক বোধ হলো জহিরুলের, কিন্তু তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ক'রে শুধু বললো, 'তুমি যাবার পর এ দু'দিন তোমার মার মুখে ভালো ক'রে কথা ফোটেনি। সাজেদা তোমাকে তার নিজের পেটের ছেলেই মনে করে।'

—'আমিও যে মা ভিন্ন আর কিছু জানি না।' বলে কেমন ভাবাবেশে একই অবস্থায় বসে রইল লালন।

আর কিছু একটাও না বলে ধীরে ধীরে কোথায় একদিকে চলে গেল জহিরুল হক্।...

সেদিন সারারাত লালনের পাশ থেকে একদণ্ডের জন্যেও উঠলো না সাজেদা। গভীর ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল লালন। কিন্তু পোড়া দু'চোখে সাজেদার ঘুম আসেনি। কেবলই বার বার মাথা তুলে অন্ধকারের মধ্যেই অনেকক্ষণ ধরে লালনের মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে হলো—একবার তার ললাটদেশ চুম্বন ক'রে বলে—'তুই যাস্‌নে, আমাকে ছেড়ে আর তুই যাস্‌নে লালন, আমি আর তবে বাঁচবো না,' কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার কি মনে ক'রে মাথা নামিয়ে নিল। এমনি ক'রেই রাত্রির প্রায় তিন প্রহর কেটে গেল।

ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখে একসময় ঘুমের মধ্যেই কথা বলে

উঠলো লালন। অথচ কি বললো, ঠিক বোঝা গেল না। সাজেদা ত্রস্তে উঠে বসে লালনের মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদুস্বরে ডাকলো, 'লালন, বাপজান, কি বলছো, কিছু যে বুঝতে পারছি না। তোমাকে বোবায় পেয়েছে লালন, লালন—!'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল লালনের। ঘর অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়েই সে বললো, 'কে, মা, তুমি? তবে যে, তবে যে—'

—'তবে যে কী বাবা?'

—'তবে যে দেখলাম—সিরাজ সাঁইজি আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আমাকে ডাকছেন!'

—'তুমি তবে তাঁকে স্বপ্ন দেখেছ বাবা! আমি যে সারারাত তোমার পাশে জেগে আছি। কই, আমি তো তাঁর গলা শুনিনি!'

—'শোনোনি?' হতাশার কণ্ঠে লালন বললো, 'তবে হয়তো আমি স্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু স্বপ্নে আর কাউকে না দেখে তাঁকে দেখলাম কেন মা?'

সাজেদা বললো, 'হয়তো তাঁর কথা তুমি ভেবেছিলে?'

—'কই, না, ভাবিনি তো!' থেমে লালন জিজ্ঞেস করলো: 'সাঁইজি এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন, না এখনও আছেন?'

—'আছেন বৈকি, কালও যে দু'দণ্ড এসে বসে আমার হাতে জলপানি খেয়ে উঠে গেলেন।' সাজেদা বললো, 'শুনেছি, এবারে নাকি এ গাঁ ছাড়বেন।'

—'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো মা। তিনি মনে মনে আমাকে ডাক পাঠিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি আমাকে ডাকছেন।' লালন বললো, 'স্বপ্নে দেখছিলাম—প্রকাণ্ড একটা তালার চাবি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলছেন—ভাবের ঘরের চাবি দিলাম তোর হাতে, এই চাবি দিয়ে এবারে তুই দরজা খোল। আমি তাঁর কাছে যাবো মা।'

সাজেদা অতকিছু বুঝলো না, শুধু বললো: 'ভোর হয়ে এলো, হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দিয়ে বাইরের দরজায় দু'পা বাড়ালেই হয়তো

তুমি তাঁর দেখা পেয়ে যাবে। বাকি রাতটুকু ঘুমোও বাবা।'

লালন বললো, 'ঘুম আর আসছে না মা। তুমি বরং ডিবাটা ধরাও, উঠে বসি।'

সাজেদা তাই করলো।

এমনি ক'রেই বাইরের প্রকৃতি একসময় ফর্সা হয়ে এলো। ভোরের স্পর্শ পেয়ে মুর্গীগুলি একবার সমস্বরে ডেকে উঠলো। গা ঝাড়া দিয়ে এবারে উঠে পড়লো লালন। সাজেদাও আর বসে রইল না। ফুঁ দিয়ে ডিবাটা নিভিয়ে দিয়ে দরজার ঝাপ খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো।

দূর থেকে মিষ্টি একটা গানের সুর ভেসে এসে প্রকৃতিকে তখন মাতাল ক'রে তুলেছে—

'আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে।
আমার সে রক্ত দেখি উজান নদী, নদী বয় তার তিনটি ধারে॥'...

ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হঠাৎ সাজেদা ব'লে উঠলো, 'ঐ তো, ঐ তো সাঁইজির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, হয়তো এদিকেই এসে পড়বেন, তোকে আর তাঁর কাছে যেতে হলো না বাবা।'

বাইরে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লালন বললো, 'তিনও বোধ কার তবে আমার অন্তরের ডাক শুনেছেন! আমি সাঁইজির কাছে দীক্ষা নেবো মা। মনে মনে আমি তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন তো মা?'

—'কেন করবেন না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুইও কি ঘর ছেড়ে দরবেশ হবি বাপজান?'

—'আমরা সবাই তো এ পৃথিবীতে দরবেশ মা। শুধু দু'দিনের জন্যে আমরা সবাই এখানে ঘুরে যেতে এসেছি। শুনতে পাচ্ছো না— সাঁইজি কি গাইছেন? দেহের মধ্যে যে পরম পুরুষ বিরাজ করছেন, তাঁরই ঘরে যে আমরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছি!'

দেখতে দেখতে সিরাজ সাঁই এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আরে, আমার লালন এসে গেছে, আজকের প্রভাত কত সুন্দর, তাই ভাবছি!'

লালন আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে এবারে সিরাজ সাঁইয়ের পা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আজ থেকে আমি আপনার, আপনি আমাকে নিন সাঁইজি।'

ছ'হাতে তাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে সিরাজ সাঁই বললো, 'আজ থেকে আমিও যে তোমার হলাম লালন। আমাকেও তুমি নাও।'

এমন অপূর্ব মিলন কোনোদিন চোখে দেখেনি সাজেদা। দেখতে গিয়ে চোখ ছুটো তার বিস্ময়ে ভরে উঠছিল। কি করবে, কি বলবে সে—বুঝে উঠতে পারছিল না।

তাকে উদ্দেশ ক'রে এবারে সিরাজ সাঁই বললো, 'তোমার ছেলেকে আজ থেকে তবে আমি নিলাম।'

সাজেদার চোখ ছুটি এবারে ছলছল ক'রে উঠলো, বললো, 'কবে ছেলেকে আমি নিজের ক'রে পেলাম যে, আজ থেকে আপনি নেবেন? লালন আপনারই।'

লালনের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে সিরাজ সাঁই বললো, 'তা হ'লে এস আমার সঙ্গে।'

সাজেদার চোখের দিকে মুখখানি তুলে ধরে লালন বললো, 'আমি তবে যাই মা, আমাকে তুমি বিদায় দাও।'

এবারে ছ'চোখ বেয়ে টসটস ক'রে জল ঝরে পড়লো সাজেদার, বললো, 'বাধা দেবো না, আর আমি বাধা দেবো না তোকে বাবা। কিন্তু এই ভোরে মুখে কিছু না দিয়েই তুই ঘর ছেড়ে যাবি?'

প্রসন্ন মুখ তুলে সিরাজ সাঁই বললো, 'ও আমার সঙ্গেই যা হোক্ ছুটো খাবে, ওর খাবার জন্যে ভাবনা নেই।' ব'লে আপন খেয়ালেই আবার সে গেয়ে উঠলো—

দেখ না রে মন ঝকমারী এই ছুনিয়াদারী!
পরিয়ে কোপ:নি-ধ্বজা হায় কি মজা
উড়ালে ফকিরী।

বড় দরদের ভাই বন্ধুজনা
ওরে সাথের সাথী কেউ হবে না
মন তোমারি !
একা পথে খালি হাতে বিদায় ক'রে
দিবে তোমারি !
... ...
বড় আশার বাসা হেথার,
কোথায় পড়ে রবে রে কার,
ঠিকানা নাই তারি !
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ো
করবি রে কার এন্তেজারী।

গাইতে গাইতে আপন খেয়ালেই আবার সে সামনের পথে এগিয়ে চললো। সঙ্গে চললো লালন। তারপর একসময় তারা সাজেদার অশ্রুক্লান্ত ঝাপ্সা দু'চোখে আড়াল হয়ে গেল।

আট

সিরাজ সাঁই কিন্তু সত্যিই আর বেশিদিন অপেক্ষা করলো না। সাধক দরবেশ সে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে আজ যে সে নিত্য কেবল অসীমেরই সন্ধান ক'রে ফিরছে। এই দেহের মধ্যেই যে সেই অসীমের লীলা। মন-পাখী ডানা মেলে নিত্য কেবল তাঁর সন্ধানেই উড়ছে। সেই অসীমের সন্ধানের সঙ্গে কখন যে তার অন্তর-পুরুষ লালনকেও সন্ধান করছিল, তা হয়তো সিরাজ সাঁই নিজেও জানতো না। লালনকে পেয়ে মনে হলো—এবারে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে তার আর দুঃখ নেই। তার যা-কিছু সাধন-ভজন—সব সে লালনকে শিখিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি এবারে যাই। তুমি আজ থেকে বাউল হলে লালন, এখন থেকে-পথ আর পর্ণকুটিরই তোমার সংসার।'

সেই থেকে লালন গায়ে নিল আলখাল্লা, কাঁধে নিল ঝোলা, আর হাতে নিল একতারা। নিঃসঙ্গ পথে পা বাড়িয়ে সেই একতারায় সুর

তুলে সে গান ধরলো—

চেয়ে দেখ্ না রে মন! দিব্য নজরে,
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক
মণিকোঠার ঘরে।
হ'লে সে চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন,
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে!
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া (দেয় রে!)
জমিনে ফলছে মেওয়া
চাঁদের সুধা ঝরে।
নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার
সফল চাঁদ দৃষ্ট হয় তার,
লালন কয় বিপদ আমার
গুরু চাঁদ ভুলে রে!

পথে পথে এমনি ক'রে কিছুকাল গান গেয়ে বেড়াবার পর একসময় কুষ্টিয়ার কালীগঙ্গার ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে পৌঁছে একটা প্রকাণ্ড বটের মূলে এসে বিশ্রাম নিল লালন। বড় ক্লান্ত, বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ জীবন। সাঁইজির কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েও মনটাকে যেন একাগ্রভাবে মনের মানুষের প্রতি নিবিষ্ট করতে পারছে না সে! ঘন ছায়া-আচ্ছাদিত বটের মূলে বসেই একসময় সে নিজের মধ্যে তপস্যামগ্ন হয়ে গেল। এমনি ক'রে কতদিন কেটে গেল, তা সে নিজেও জানে না। একসময় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো—সামনে দু'টি তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে আছে; পরনে জীর্ণ বসন, দেহে দারিদ্র্যের ছাপ। লালন জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কে?'

যুবক দু'টি এবারে সমস্বরে বলে উঠলো: 'আমরা সাঁইজির অনুগ্রহ প্রার্থী, আমি শীতল সা আর আমি ভোলা সা।'

—'শীতল আর ভোলা!' থেমে পুনরায় লালন জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু তা হলেই তো আর পরিচয় হয় না, তোমাদের কোন্ বাড়ি, এখানেই বা কিসের অনুগ্রহ চাচ্ছো ?'

এবারেও শীতল আর ভোলা একসঙ্গে বললো, 'বাড়ি কোথাও নেই, গৃহহীন পরিজনহীন আমরা। সাঁইজি যদি দয়া ক'রে পায়ে ঠাঁই দেন, তবে সারা জীবন গুরুর সেবা ক'রে আমরা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি।'

লালন বললো, 'বলো কি ? এ পৃথিবীতে আমার নিজেরই যে কোথাও ঠাঁই নেই, তোমাদের আমি ঠাঁই দেবো কোথায় ?'

শীতল বললো, 'বলেছি তো, সাঁইজির পায়ে।'

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে কী ভাবলো লালন, তারপর স্নেহ-মধুর কণ্ঠে বললো, 'তোদের নাম দু'টো কিন্তু বেশ। ডাকলে মন শীতলও হয়, আবার মন ভুলেও থাকে। এ বেশ ভালই হলো ; আমার এক-দিকে শীতল, আর একদিকে ভোলা। তা—এক কাজ করতে পারবি ?'

—'আদেশ করুন।'

—'পাখির মতো খড়কুটো কুড়িয়ে এনে এখানে কিছু-একটা আস্তানা দাঁড় করাতে পারিস ?'

—'কেন পারবো না সাঁইজি! দেখুন না, আমরা আজই কুটির বেঁধে তুলছি।' বলে ভোলা সা এবারে কী একটা ইঙ্গিত ক'রে শীতল সার মুখের দিকে তাকালো। তারপর অল্পসময়ের মধ্যেই তারা কাজে লেগে গেল।

পাশাপাশি দু'তিনখানি খড়ের চালা।

লালনের আখড়া গড়ে উঠলো বটের মূলে। আবার তা হলে ঘর বাঁধলো সে। চাপড়ার ঘরে ছিল মা আর দয়া, এঘরে আজ শীতল আর ভোলা। কিন্তু আসল ঘরের সন্ধান যে তার আজও হলো না। নিজের অলক্ষ্যেই একবার গেয়ে উঠলো সে—

'ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়,

আপন ঘর না বুঝে, বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।...

শীতল জিজ্ঞেস করলো: 'এ ঘর কি আপনার পছন্দ হয়নি সাঁইজি?'

—'পছন্দ!' শব্দটা উচ্চারণ ক'রে মুখ টিপে একবার হাসলো লালন, তারপর একতারায় সুর তুলে গাইল—

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে?
আমি জনম ভ'রে একদিনও দেখলেম নারে!
নড়েচড়ে ঈশান কোণে,
আমি দেখতে পাই না দু'নয়নে,
হাতের কাছে যার ভবের হাটবাজার,
হাত বাড়ায়ে ধরতে পেলেম না তারে।

সামনে এসে নীরবে বসে ভোলা সা জিজ্ঞেস করলো, 'সে মানুষ কোথায় সাঁইজি?'

লালন বললো, 'বিষয়ের চোখ নিয়ে কি তাঁকে দেখা যায় রে, রসের মানুষকে দেখতে যে রসের চোখ চাই।' বলে গলায় সুর তুললো লালন—

সোনার মানুষ ভাসছে রসে,
যে জানে সে রসপান্থি
সেই দেখতে পায় অনায়াসে।
তিনশো ষাট রসের নদী,
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি,
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

ভোলা সা জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের এই দেহের মধ্যেই কি তবে সেই মানুষ বিরাজ করে সাঁইজি?'

লালন বললো, 'আগে দেহটাকে জান, তবে তো মানুষকে জানবি! ষট্‌চক্রভেদী সাধনায় বলে—এই দেহে ছয়টি চক্র আছে!'

ভোলা সার পাশে এসে এবারে শীতল সাও বসে পড়লো।

লালন বললো, 'যেমন—মেরুদণ্ডের শেষভাগে মূলাধার, তার উর্ধ্বে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, তার উর্ধ্বে নাভিস্থলে মণিপুর, তদূর্ধ্বে হৃদয়ে অনাহত, তারপর কণ্ঠে বিশুদ্ধ, তারও উপরে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা,—এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্নাপথে অবস্থিত।'

বোকার মতো মুখের ভঙ্গি ক'রে ভোলা বললো, 'কিছু যে বুঝলাম না সাঁইজি?'

—'সাধনা কর, তবে তো বুঝবি।' থেমে লালন বললো, 'কুণ্ডলী-শক্তি যখন মূলাধারের বিবর থেকে সুষুম্না পথ বেয়ে উপরের চক্রগুলি অতিক্রম ক'রে অবশেষে অচিনদল অর্থাৎ সহস্রার বা সপ্তম ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখনই সাধক চির আকাঙ্ক্ষিত গুরুকে দর্শন করতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক চক্র অতিক্রমকালে বিভিন্ন প্রকারের দর্শনলাভ হ'য়ে থাকে, তারপর আমাদের দেহান্ত হবার পর জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হ'য়ে যায়।' বলে আর একবার একতারায় সুর ধরলো সে—

'কিবা শোভা দ্বিদলের 'পরে
রাসমণি মাণিক্যের রূপ ঝলক মারে।
অবিস্ব সম্মতে সানিত্য গোলক,
তাহে বিরাজ করে পূর্ণ ব্রহ্মলোক,
হ'লে দ্বিদল নির্ণয়, সব জানা যায়,
প্রসন্ধি থাকে না সাধন দ্বারে।
শত কিম্বা সহস্র দল
রসমতি করে চলাচল,
ওগো দ্বিদলেতে স্থিতি দিব্য আকৃতি,
ষোল দলে বারাম যুগান্তরে।
ষড়োদলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়,
দশম দলে মৃণাল গতি গঙ্গা বয়,
ওগো তীব্র ধারা তার, শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে।

শীতল আর ভোলা এবারে সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের আপনি সাধনার মন্ত্র দিন সাঁইজি।'

লালন বললো, 'মন্ত্র আবার কি রে? মন তোর, এই তো মন্ত্র! আগে নিজেকে জান, তবে তো তাঁকে জানবি। দেহ জেনে মন জান, মনকে জানলেই তো মনের মানুষকে পাবি! তুই কে, কোথা থেকে তুই এলি, এই মর্ত্যধামে থেকেই বা তোর কি কাজ, আবার অন্তিমেই বা তুই যাবি কোথায়, এ যদি না ভাবতে শিখবি, তবে যে মনুষ্যজন্ম পেয়েও তাকে মূল্য দিতে পারবি নে। তাই তো বলি—

আপন খবর আপনারে হয় না,
আপনারে চিনলে পরে
যায় অচেনারে চেনা।

বলতে বলতে আপনমনেই আবার গানে মত্ত হয়ে গেল লালন: শীতল আর ভোলা বোধ করি সাঁইজির জন্যে ফলের সন্ধানে কোথায় একদিকে বেরিয়ে গেল।

এমনি ক'রেই দীর্ঘকাল কেটে গেল।···

শুধু তন্ত্র সাধনার মধ্যেই নিশ্চিন্ত ছিল না লালন, তু'হাত বাড়িয়ে যেমন সে অচিনদলের মনের মানুষের সন্ধান করেছে, তেমনি এক তন্ত্র থেকে আর এক তন্ত্রের মধ্যে সত্যকে খুঁজে মরেছে। বৈষ্ণব হয়ে সে বৈষ্ণব-সাধনা করেছে, ইসলামের মধ্যে খুঁজেছে সেই পরম এককে। কোথায় আছেন, কিসের মধ্যে আছেন তিনি? তাঁকে নইলে যে এ জীবন মিথ্যা, এ জীবন মুল্যহীন। সংসারকে সে আশ্রম করেছে, আশ্রমকে করেছে শ্মশান. শ্মশানকে করেছে গোকুল, সেই গোকুলে দাঁড়িয়ে তু'হাত বাড়িয়েছে সে গোকুলেশ্বরের উদ্দেশে।

ততদিনে আরও অনেক শিষ্য ও শিষ্যায় আখড়া ভরে উঠেছে। যতক্ষণ পারতো, ছাউনির বাইরেই কাটিয়ে দিত লালন। শিষ্য আর শিষ্যারা কাছে এসে দাঁড়ালে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠতো—'আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে।' সেই ঝাঁকে তার চারদিক ভরে যেতো। কেউ কেউ

জিজ্ঞেস করতো : 'আপনার কি জাত সাঁইজি ? হিন্দু বলে ভাবতে গিয়ে মুসলমান বলে সন্দেহ হয়, আবার বৈষ্ণব বলে ভাবতে গেলে শাক্ত বলে মনে হয়। কি জাত আপনার সাঁইজি ?'

লালন বলেছে : 'মনের মানুষ যে রাজ্যের অধিবাসী, সেখানে হিন্দু-মুসলমান বৈষ্ণব-শাক্ত বলে কোনো জাত নেই, সেখানে সবাই এক। আর আমি ?' বলে একতারায় সুর তুলে গান ধরেছে সে—

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে !
লালন কয় জেতের কি রূপ
দেখলেম না এ নজরে।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান ?
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নী চিনি কিসে রে ?
কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায় ?
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ?
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করেন যথাতথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ-বাজারে।

শুনে কারুর মুখে আর কথা নেই।

মুখ তুলে লালন জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে, তোরা সবাই লজ্জা পেলি নাকি ? তা আমার কেন, এই যে তোরা সবাই এলি, তোদেরই কি কোনো জাত আছে ? তোরা তো সবাই মরমীয়া, সবাই সহজিয়া ! এখন বল্ তো, তোদের কার কি জাত ? তোদের কে হিন্দু, আর কে মুসলমান ?'

জবাব দিতে না পেরে এবারে লজ্জায় সকলে আরক্তিম হয়ে

উঠলো।

—'কি রে, বলতে পারলি না তো?' কৌতুক বোধ ক'রে এবারে আপনমনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো লালন। সহজ প্রাণের মরমী হাসি! সেই হাসি সন্ধ্যার সেঁউড়িয়ার বনবীথির পাতায় পাতায় গিয়ে দোল খেতে লাগলো।

এমনি ক'রে আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল।

নয়

তারপর আরও কয়েকটা বছর।

শিষ্য আর শিষ্যায় আখড়াটা ইদানীং প্রায় ভরে উঠেছিল। তারা সাঁইজির সেবা ক'রে জীবনকে ধন্য করতে চায়। কিন্তু সেই সেবার জন্যে লালন বসে থাকবার লোক ছিল না। হাতমধ্যে চেষ্টা ক'রে নিজের জন্যে আর একটা ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিল সে। ঘোড়ায় চড়ে বিবিধ মনের মানুষকে একতারার সুরে এক ক'রে নিয়ে পথ চলা যায়। মাতব্বরের দুঃখ সে ভোলে নি, এবারও তাই নতুন ঘোড়া এনে তার পিঠের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে ডাকলো, 'মাতব্বর, আমাকে নিয়ে চলতে পারবি তো? পারবি তো আমাকে নিয়ে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন ঘুরিয়ে আনতে?'

তার মুখের দিকে নিজের প্রকাণ্ড মুখটা তুলে ধরে ঘোড়াটা একবার ডেকে উঠলো: চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—।

—'সাবাস মাতব্বর, সাবাস।' ব'লে শীতল আর ভোলার উদ্দেশে গলা ছেড়ে লালন বললো, 'মাতব্বরকে দানা দে, পানি দে, কাছে নিয়ে একটু আদর-যত্ন কর।'

শিষ্যদের মধ্যে শীতল আর ভোলা সা লালনের নিজের সন্তানের মতো ছিল! সাঁইজির ডাকে সাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারা মাতব্বরের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। এ পরিচর্যা যে সাঁইজিরই পরিচর্যা! সাঁইজি যাকে ভালোবাসেন, তার মনের মধ্যে যে সাঁইজিই বিরাজ করছেন। তাতে আর সাঁইজিতে যে এতটুকুও পার্থক্য নেই।

সেই মাতব্বরের মুখে লাগাম পরিয়ে সেদিন প্রথম তার পিঠে চড়ে বসলো লালন।

কাছে এসে শীতল জিজ্ঞেস করলো, 'দূরে কোথাও যাবেন না তো সাঁইজি?'

খানিকটা অন্যমস্কের কণ্ঠে লালন বললো, 'ভাবছি একবার চাপড়া গিয়ে ঘুরে আসবো।'

ব্যস্তকণ্ঠে শীতল বললো, 'সে যে দূরপথে অনেকটা! আমি কিংবা ভোলা কেউ সঙ্গে আসবো?'

—'কেন, আমি কি হারিয়ে যাবো, না পালিয়ে যাবো?' বলে মুখ টিপে হেসে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষলো লালন।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো মাতব্বর।

একতারায় সুর তুলে গান ধরলো লালন—

দিল-দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা।
দেহের মাঝে বাড়ি আছে,
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁধ কাটিছে,
চুরি করে একজনা।
দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতলো না।...

গাইতে গাইতে কখন যে সে চাপড়ার পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তা সে নিজেই টের পায়নি। চারদিকে তাকাতে গিয়ে কেমন নতুন মনে হচ্ছিল সব। তার শিশুকালের ক্রীড়াভূমি, বাল্যের বৃন্দাবন আর যৌবনের লীলাক্ষেত্র এই চাপড়া, ভাণ্ডারিয়া! এ গ্রাম ছাড়ার পর দেখতে দেখতে কত বছরই তো কেটে গেল। চারদিকে তাকাতে গিয়ে এখন সব নতুন মনে হচ্ছে। তবু হয়তো পুরনো মানুষগুলো আজও ঠিক তেমনিই আছে। তা থাক। তাদের সঙ্গে দেনা-পাওনা কবেই তো

মিটেছে। আজ তারা কাছে এসে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রেও হয়তো তাকে চিনতে পারবে না। মাথার চুলে বাবড়ির পাক, সারা মুখে শোভা পাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ, সর্বাঙ্গ আলখাল্লায় আবৃত, কাঁধে ঝোলা আর হাতে একতারা। সেদিন যারা তাকে প্রেত বলে পরিহার করেছিল, আজ তারা দানোর দেশের তন্ত্রসাধক বলে তাকে অবজ্ঞা করবে।

ভাবতে ভাবতে একসময় এসে নিজেদের বাড়িটার সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো লালন। বাড়িটারও আজ আর সে অবস্থা নেই, জরা-জীর্ণ ঘরে আজ ঘুণ ধরেছে। তাকাতে গিয়ে চোখে একবার জল এলো লালনের। কোনোরকমে সেটুকু সংবরণ ক'রে নিয়ে মাতব্বরের পিঠ থেকে নেমে অনুচ্চকণ্ঠে একবার ডাকলো সে : 'মা, মাগো, আমার মা কই গো?'

কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এবারে একতারায় সুর তুলে আরও ছু'পা কাছে এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ডাকলো লালন : 'মা, তুমি কোথায় মা?'

এবারে একতারার সুর শুনে গৃহের অন্তরাল থেকে কে একটি প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে এসে অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে নম্রকণ্ঠে বললো, 'ঘরে আমার ছেলের অসুখ, আজ আমি ভিখ দিতে পারবো না ফকির-বাবা।'

লালন বুঝলো—এখানে তবে আজ আর তার মা কিংবা দয়া কেউ নেই; কিন্তু যাবে কোথায় তারা? এঘর ছেড়ে তাদের যে এ সংসারে যাবার জায়গা নেই কোথাও! একটুকাল থেমে সে বললো, 'আমি ভিখ চাই না, আপনার ছেলের কল্যাণ হোক মা।'

নিরুত্তরে মহিলাটি পুনরায় ঘরেই প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ কণ্ঠে লালন জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, আমাকে একটা খবর দিতে পারবেন মা? এখানে যে লালন তার মা আর স্ত্রীকে নিয়ে ছিল, তারা এখন কোথায়?'

এবারে অবাক হয়ে মহিলাটি বললো, 'এই দেখ কাণ্ড, লালন তো সেই কবে সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তার বউ দয়াও তো মারা

গেল দুই সন হলো। সেই থেকে লালনের মা সংসার ছেড়ে বৈরাগী শুম্ভু মিত্রের আখড়ায় গিয়ে কাটাচ্ছেন। যাবার আগে আমাদের তিনি এ-ঘরে থাকতে দিয়ে গেলেন।'

বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল লালনের। দয়া তবে আজ আর বেঁচে নেই? মাও ঘর ছেড়ে ভেকাশ্রিতা হলেন! কোনোভাবে নিজেকে সংবরণ ক'রে সে বললো, 'আচ্ছা মা, আসি তবে।'

মহিলাটি এবারে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে পুনরায় রোগ-ক্লান্ত ছেলের শিয়রে গিয়ে বসলো।

দাঁড়িয়ে যে একটুকাল ভাববে লালন, এমন অবস্থা ছিল না। এমন কি মাতব্বরের পিঠে চড়তেও আর ইচ্ছে হলো না। হাঁটতে হাঁটতে এক-সময় সে শুম্ভু মিত্রের আখড়ায় এসে পৌঁছালো। শুম্ভু মিত্রও বৈরাগী, সেও বৈরাগী। সেখানে হয়তো জাত নিয়ে, সংস্কার নিয়ে কথা উঠবার অবকাশ কম। এসে আবার সে তেমনি ক'রেই ডাকলো: 'মা, মাগো, আমার মা কোথায়, মা?'

আখড়ার আঙিনায় বসে মালা জপছিলেন পদ্মাবতী। আজ আর দেহে তাঁর শক্তি নেই, দেহ ভেঙে পড়েছে, মন তো সেই কবেই ভেঙেছে! কেমন একটা পরিচিত শব্দ কানে ভেসে আসতেই মনটা তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠলো। উন্মুখ হয়ে সামনে তাকাতেই আবার সেই শব্দ এসে কানে বিঁধলো, 'মা, আমার মা কোথায়? আমি যে মার সঙ্গে দেখা করতে সেই কতদূর থেকে এসেছি!'

এবারে আর গলা চিনতে এতটুকুও দেরি হলো না পদ্মাবতীর। এ যে তাঁর লালনের কণ্ঠ! এ কণ্ঠস্বরকে কি তিনি কখনও ভুল করতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগোতে যেতেই আবার বসে পড়লেন তিনি। দেহ নিয়ে নড়তে পারলেন না।

ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে লালন।

—'মা, মাগো—।'

চেহারা চিনতে না পেরে পদ্মাবতী অবাক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'কে, কে তুমি বাছা?'

এবারে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পাশে বসে পড়ে লালন বললো, 'আমি লালন, তোমার লালন মা। দেখলে তো, তোমার ছেলেকে আজ তুমিও চিনতে পারছো না মা।'

ভাবাবেগে দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে এবারে কেঁদে ফেললেন পদ্মাবতী। বললেন, 'আজ তবে তুই ফকির হয়েছিস বাবা? এই হতেই তবে তুই সেদিন ঘর থেকে বেরিয়েছিলি?'

লালন বললো, 'এখনও বোধ করি পুরো ফকির হতে পারিনি মা, সাধনা করছি, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আখড়া করেছি। কিন্তু তোমাকে না দেখে শান্তি পাচ্ছিলাম না, তাইতো ছুটে এলাম।'

কাঁদতে কাঁদতে পদ্মাবতী বললেন, 'এ তুই কোথায় এলি বাবা, কি দেখতে এলি? আমার চোখের সামনে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌমা মরলো, মরলাম তো আমিও। ঘরকে শ্মশান ক'রে অন্যেকে ছেড়ে দিয়ে আমি আজ গোবিন্দের পায়ে পড়ে আছি। এ তুই কোথায় এলি বাবা?'

লালন বললো, 'কেন, মার কাছে এলাম, মায়ের পায়ের তীর্থরেণু মাথায় নিয়ে প্রাণ জুড়োলাম। আবার কোথায় আসবো মা?'

পদ্মাবতী বললেন, 'আমাকে আর মা বলিস কেন, আমি তো রাক্ষসী; আমি তোকে মেরেছি, বৌমাকে খেয়েছি, সংসারকে শ্মশান করেছি। তবু বলবি আমি মা?'

—'সবই কপাল, কথায় বলে—কপালের নাম গোপাল। তা তুমি কি করবে মা? সংসারে কারুর ইচ্ছেয় কিছু হয় না। সব সেই গোবিন্দের ইচ্ছে। চোখের জল মোছ মা, আমি তোমাকে গান শোনাই।' বলে একতারায় সুর তুলে গান ধরলো লালন—

সকলই কপালে করে।
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোবরে;
যদি থাকে এই কপালে,
রত্ন এনে দেয় গোপালে,

কপালে যেমতি হলে
　　দুবলা বনে বাঘে ধরে।
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী,
কপালের ফল হয় সবারি,
মনের ঘোরে বুঝতে নারি
　　খেটে মরি অনাকারে।
যার যেমন মনের কামনা,
তেমনি ধন পেয়েছে সে না!
লালন বলে ভাবলে হয় না—
　　বিধির কলম আর কি ফেরে!

পদ্মাবতীর দু'চোখ বেয়ে অঝোরধারায় জল গড়িয়ে পড়ছিল।

গান থামিয়ে লালন বললো, 'এমনি ক'রে তোমার শুধু চোখের জল দেখতেই কি তবে আমি এলাম মা?'

পদ্মাবতী বললেন, 'চোখের জলটুকু ভিন্ন আজ আর আমার কি আছে বাবা?'

লালন বললো, 'ঘর ছেড়ে নিজেকে যদি গোবিন্দের পায়েই দিলে মা, তবে চোখের জলটুকুও বা তাঁকে দিতে বাকী রাখলে কেন? যদি দিলে, তবে সবটুকুই দাও।' বলে হঠাৎ নিজের মধ্যে কেমন সমাহিত হয়ে গেল লালন।

পদ্মাবতী বললেন, 'নিজেকে দিয়েই বা তাঁকে পেলাম কই রে?'

উত্তরে লালন কিছু একটাও না বলে পুনরায় আপন খেয়ালে গান ধরলো—

আমি একদিনও না দেখলেম তারে!
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
　　　　পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা, নাই তরণী
　　　　　　পারের।

মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে,
কেমনে সে গাঁয়ে যাই রে!
কি কবো পড়শীর কথা,
ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা
নাই রে!
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
ও মোর যম-যাতনা সকল যেতো
দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে!

ততক্ষণে সেবাইতদের অনেকের ভিড়ে জায়গাটা ভরে উঠেছে। গানের মধ্যে মিশে গিয়েছিল তারা। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে পদ্মাবতী বললেন: 'আমার ছেলে লালন। আজ ও সাধক ফকির। আমি যে কোনোদিন ওকে পেটে ধরেছি, আজ তা ভাবতেও পারি না। ছোটবেলা থেকেই ও মুখে মুখে গান বেঁধে গায়। তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, এই গানই ওকে একদিন সাধক ক'রে তুলবে!'

শুনে সেবাইতরা যুক্তহাতে লালনকে নমস্কার ক'রে বললো: 'আপনার দর্শন পেয়ে আজ আমাদের মন ভরে গেল। ভেবেছিলাম—আমরাই একদিন সেঁউড়িয়ার আখড়ায় গিয়ে ঘুরে আসবো; তা—'

কথা শেষ না হতেই দরজার সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে মাতব্বর একবার চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠলো।

তৎপর হয়ে লালন বললো, 'দাঁড়া, যাচ্ছি।'

সেবাইতদের কে একজন উদ্যোগী হয়ে বললো, 'আপনার সঙ্গে ঘোড়া আছে?'

—'হ্যাঁ, ঘোড়া নিয়েই বেরিয়েছি। নইলে দূরপথ হেঁটে বেড়াতে

বড় কষ্ট হয়।' থেমে মায়ের উদ্দেশে লালন বললো, 'জানো মা, এবারও আমি ঘোড়াটার নাম রেখেছি মাতব্বর।'

উত্তরে পদ্মাবতীর মুখে কথা ফুটলো না। কেমন একটা ভাবাবেগে অনেকক্ষণ তিনি নীরবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটি সেবাইতকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'তুমি এক কাজ করো নিত্যানন্দ, গোবিন্দের কিছু ভোগ এনে দাও লালনকে। কোনোদিন তো ও মুখ ফুটে কিছু বলেনি, ক্ষিদেয় এতক্ষণ ওর পেটের মধ্যে কিছু নেই।'

হেসে লালন বললো, 'মিথ্যে বলোনি মা। সত্যিই ক্ষিদে পেয়েছে। দাও, ঠাকুরের ভোগ খেয়ে আজকের মতো উঠি। বড় ইচ্ছে হয় তোমাকে আমার আখড়ায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করি মা, কিন্তু জানো তো—আমি জাতের কিছু রাখিনি। তাই তোমার বাকী দিনগুলি তোমাকে আর মিছেমিছি কষ্ট দেবো না। এসে এসে এমনি ক'রে আমি তোমাকে মাঝে মাঝে দেখে যাবো।'

—'তাই যাস্ বাবা।' পদ্মাবতী বললেন, 'গোবিন্দ আমাকে তাঁর পায়ে টেনেছেন। এ দেহ আর বেশিদিন নেই। এসে এসে দেখে যেতে যেতে কবে দেখবি আমি আর নেই।'

মাকে জড়িয়ে ধরে এবারে লালন বললো, 'আবার তো তুমি আজেবাজে কথা শুরু করলে!'

ছেলের মাথার উপরে মুখ রেখে পদ্মাবতী বললেন, 'যা ধ্রুব, তা কি কখনও বাজে হয় রে! কিন্তু থাক, আর বলবো না। তুই শুধু দু'দণ্ড আমার কাছে বস্ বাবা।'

লালন আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তাই করলো, তারপর একসময় গোবিন্দের ভোগ মুখে দিয়ে মাতব্বরের পিঠে গিয়ে আবার চেপে বসলো।

দশ

আখড়ায় ফিরে এসে দিনকয়েক ধরে কেন যেন মনটা কিছুতেই ভালো লাগছিল না লালনের। নানা দিকের নানা কথা ঘুরে-ফিরে মনে এসে কেবলই তাকে উতলা ক'রে তুলেছিল। শীতল আর ভোলার কাছে সেটুকু ঢাকা ছিল না; অথচ সাহস ক'রে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তাও পারছিল না। একসময় লালন নিজে থেকেই তাদের কাছে ডেকে বললো: 'আমাকে একটু একা থাকতে দে তোরা।'

শীতল আর ভোলা সেই ব্যবস্থাই করলো। স্নানের জন্যে তাড়া দিল না, খাবার জন্যে উদ্ব্যস্ত করলো না; লালন নিজে থেকে কাউকে কাছে না ডাকলে কেউ কাছাকাছি দিয়ে ঘেঁষলো না।

এমনি করেই দিন কয়েক কেটে গেল।

এ ক'দিন আপন মনে তন্ময় হয়ে শুধু গানের পর গান গেয়েছে লালন। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কেউ কাছাকাছি দিয়ে না এলেও প্রতি-দিন গানের শেষে চোখ উন্মোচন ক'রে লালন লক্ষ্য ক'রে দেখেছে —কে একটি অপরিচিত মেয়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেহে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; কালো চেহারায় তবু দেখতে কুশ্রী নয়। ডাগর ডাগর চোখ দু'টি, মাথাভর্তি কালো মেঘের স্তবকের মতো চুল। সেই ডাগরদীপ্ত চোখ দুটি মেলে সে তাকিয়ে আছে লালনের মুখের দিকে। এমনি ক'রে কত লোকই তো এ-পথ দিয়ে যায়, যেতে যেতে তাকায়, তারপর আবার নিজের পথ ধরে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে সে-দলের মনে হলো না। প্রায় প্রতিদিনই এসে দূরে দাঁড়িয়ে আপন মনে সে তার গান শোনে, গান শেষ হলে আপন মনেই আবার সে কোথায় একদিকে চলে যায়! সেদিন একতারায় সুর তুলে তন্ময় হয়ে লালন গান করছিল—

সে ভাব সবাই কি জানে!
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা
গোপীর সনে।
গোপী বিনা জানে কেবা

শুদ্ধ রস অমৃত সেবা,
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ দরশনে।
গোপী অনুগত যারা,
ব্রজের সে ভাব জানে তারা,
নীর হেতু অধর ধরা
গোপীর মনে।
টলে জীব অটল ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর,
লালন কয় রসিক বিভোর
রস ভিয়ানে।

গান শেষ হলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো লালন—আজও সেই মেয়েটি কখন এসে তেমনি অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন বড় মায়া হলো লালনের। হাতের ইশারায় এবারে কাছে ডাকলো সে মেয়েটিকে।

এতটুকুও দ্বিধা না ক'রে সামনে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি। অন্য কোনো পুরুষ হলে হয়তো এভাবে সে এসে দাঁড়াতে পারতো না কিন্তু ফকির-দরবেশের সামনে এসে দাঁড়াতে কোনো লজ্জা নেই। মেয়েটিকে দেখে অন্ততঃ তার মুখে-চোখে এতটুকুও লজ্জা খুঁজে পাওয়া গেল না.

লালন বললো, 'তুমি প্রায়ই এসে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে আমার গান শোনো, তাই না?'

মেয়েটি বললো : 'হুঁ।'

লালন বললো : 'আমার গান তোমার ভালো লাগে?'

মেয়েটি বললো : 'শুধু ভালো লাগে কেন, গানের মধ্যে মনে হয় আমি হারিয়ে যাই।'

সারা মন এবারে কেমন একটা খুশীতে ভরে উঠলো লালনের। একটুকাল থেমে সে বললো, 'সারা দেশের লোক তো কীর্তন শুনতে অভ্যস্ত! কীর্তনের চাইতেও আমার গান তোমার ভালো লাগে?'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে মনে হলো—কেমন যেন খট্‌কায় পড়লো!

কৌতুক ক'রে লালন বললো, 'তা হলে কীর্তন তোমার আরও ভালো লাগে?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে এবারে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো: 'তোমার গান তো বাউল গান, তাই না?'

—'বাউলেরা অন্তত তাই বলে।'

—'তবে বাউল ছাড়া আমার আর কোনো গান ভালো লাগে না।' বলতে গিয়ে লালনের চোখে চোখ পড়তেই নিজের চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নিল মেয়েটি।

লালন বললো, 'বস না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

মেয়েটি বললো, 'কাজ থেকে ফিরতে তবে আমার দেরি হয়ে যাবে।'

—'কাজ আবার কিসের?'

—'কেন, আমাদের পানের বরোজের। ঐ উদিকে আমাদের মস্ত পানের বরোজ আছে। রোজ এসময়ে আমি বরোজে গিয়ে কাজ সেরে তবে ঘরে ফিরি।'

—'খুব কাছেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?'

—'একেবারে কাছে নয়, আবার দূরেও নয়। এখান থেকে দুটো বাঁক ঘুরে বাহাদুর মোল্লার বাড়ির পাশে।'

মুখ টিপে হেসে এবারে লালন বললো, 'সেঁউড়িয়া গাঁয়ে বাহাদুর মোল্লার তবে খুব নামডাক আছে?'

নিজের গালে হাত চেপে এবারে মেয়েটি বললো, 'আছে আবার না! সে যখন গত হয়েছে, আমি তখন খুব ছোট। সেই থেকে সকলের মুখে আমি ঐ নাম শুনে আসছি।'

এবারে হেসে ফেলে লালন বললো, 'তাই বলো! তা—তোমার নিজের নামটা বলবে না, এই তো?'

—'কেন, আমার নাম তো সাকিনা! আব্বা আর আম্মা আমাকে

এই নামেই ডাকে।' বলে চোখ দুটো একবার পিটপিট করলো মেয়েটি।

লালন বললো, 'এখন থেকে আমিও তবে সাকিনা বলেই ডাকবো, কেমন?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে এবারে সাকিনা বললো, 'আমি এখন যাই, আবার কাল এসে তোমার গান শুনবো, ফকির সাব।' বলে আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুতপায়ে সোজা সে এবারে নিজের কাজে চ'লে গেল।

যেন একমুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা দোলা দিয়ে গেল সাকিনা লালনের মনে। বেশ লাগছিল সাকিনাকে। দয়াকেও একদিন এমনি লেগেছিল। ভাবতে ভাবতে কখন আবার নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল লালন।...

পরদিন আবার সাকিনা এসে তেমনি করেই দাঁড়ালো। গাইতে গাইতে আজ যেন বারবার কেমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল লালন। আজও গানের পর চোখ মেলে সাকিনাকে কাছে ডেকে লালন বললো, 'আজ আর অমনি অমনি খালি হাতে চলে যেয়ো না, ওতে আমার মনের মানুষ কষ্ট পায়। যাবার আগে কিছু মুখে দিয়ে যেয়ো।'

আপত্তি না ক'রে দু'দণ্ডের জন্যে দাওয়ার একপাশে এসে বসলো সাকিনা। বললো, 'আর একখানা গাও না ফকির সাব।'

লালন বললো, 'রোজ রোজ এসে এই যে চুরি ক'রে গান শোনো, তবু তোমার সাধ মেটে না?'

চোখ দুটোকে পিটপিট ক'রে সাকিনা বললো, 'একবার মধু খেলে বুঝি আর খেতে ইচ্ছে করে না? তোমার গান যে সেই মধু গো; ও যে বার বার শুনেও সাধ মেটে না!'

এমনি ক'রে এতদিন কেউ লালনের গান সম্পর্কে বলেনি। শুনতে শুনতে আবার যেন নিজের মধ্যে সে কেমনই হয়ে গেল!

তাড়া দিয়ে সাকিনা বললো, 'কই, গাও না ফকির সাব, শুনে

তবে উঠি।'

—'বস, শীতলকে ডাকি, তোমার জন্যে কিছু নিয়ে আসুক। মুখে দিতে দিতে গান শোনো।' বলে শীতলের উদ্দেশে গলা তুলতেই শীতল এসে সামনে দাঁড়ালো, তারপর নানা ফলমূলে একটি পাত্র পূর্ণ ক'রে এনে সাকিনার সামনে সে নামিয়ে দিয়ে গেলে লালন বললো, 'খাও, আমি গাই।'

খাবারের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে আপত্তি তুলতে যাচ্ছিল সাকিনা, কিন্তু সে কথা কানে না তুলে লালন গান ধরলো—

আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে,
ও ধারার সনে আছে মানুষ ধরো সে ধারায় রে।
তিনশত ষাইট নদী, রসের নদী বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি,
সেই নদীতে প্রাণ বান্দিলে মানুষ ধরা যায় রে।
লালন সা ফকিরে বলে রে পাঁচু, বুদ্ধি তোর নাই কিছু,
বেদাতির রস পান করিলে মৃত্যুহরণ হয় রে।...

এমনি ক'রে আরও দিন দু-তিন কেটে গেল। এতদিন সাকিনা যেখানে একবার এসে ঘুরে যেতো, এখন সে মাঝে মাঝেই এসে আখড়ায় উঁকি দিয়ে যেতে লাগলো; তারপর সুযোগ পেয়ে একসময় কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বুঝি শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ নেই ফকির সাব?'

লালন বললো, 'মা আছেন, তবে তিনিও আজ গৃহহীনা সন্ন্যাসিনী।'

সাকিনা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার শিষ্যরাই তবে তোমার পরিচর্যা করে?'

—'হুঁ'; শীতল আর ভোলাকে কিছু বলে দিতে হয় না, ওদের অতিরিক্ত পরিচর্যার ঠেলায় আমি নিজেই বরং অতিষ্ঠ হয়ে উঠি।'

চারদিকে কেমন একবার টালুমালু ক'রে তাকিয়ে এবার সাকিনা বললো, 'আমাকেও তোমার শিষ্যা ক'রে নেবে ফকির সাব? আমিও তবে তোমার সেবা করতে পারবো!'

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন একবার বিষম খেলো লালন, তারপর শান্তকণ্ঠে বললো, 'তোমাকে পেলে সকলের থেকে আলাদা ক'রেই তোমাকে রাখবো। ওরা সবাই আমাকে গুরু বলে ভক্তি করে, তুমি ওদের গুরু-মা হতে পারবে না?'

বুকের ভিতরটা এবারে উত্তাল হয়ে উঠলো সাকিনার, মুখ তুলে যে ভালো ক'রে লালনের মুখের দিকে তাকাবে, এমন শক্তি রইল না। কিছুক্ষণ কেমন আচ্ছন্নের মতো বসে রইল সে। চোখ দুটো একবার অশ্রুকণায় চিক্‌চিক্ করে উঠলো।

একটুকাল থেমে লালন পুনরায় বললো, 'কেমন, পারবে না সাকিনা?'

এবারে চুপ ক'রে থাকা কঠিন হলো সাকিনার পক্ষে। মাথা নিচু করেই সে বললো, 'এতকাল পানের বরোজ ক'রে আমার কেটেছে, আমি তো সাধন-ভজন কিছু জানি না, আমি—আমি—'

কথা শেষ করতে পারলো না সাকিনা, বুকখানি তার মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগলো।

লালন বললো, 'আমার ভার নিতে হলে যে আমার সব কিছুই তোমাকে নিতে হবে, আমার সাধন ভজন সব। বলো, নেবে?'

'তাই দিও, তাই দিও ফকির সাব; এখন আমি যাই।' বলে একমুহূর্তও আর অপেক্ষা না ক'রে দাওয়া ছেড়ে দ্রুতপায়ে কোথায় একপলকে মিলিয়ে গেল সাকিনা।

কেমন আচ্ছন্নের মতো দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল লালন।

এরপর কয়েকটা দিনও কাটলো না। সাকিনাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলো লালন। সাকিনার বাবা সুবিদ আলী খুশীমনে মেয়েকে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল তার ঘরে। শিষ্যদের মধ্যে খুশীর ছড়াছড়ি সেদিন। তাদের সাঁইজি নিকাহ করেছেন, এ কি কম আনন্দের কথা! দেখতে দেখতে চারদিকে মহচ্ছব লেগে গেল। ভাণ্ডারা বসে গেল চারদিকে। মাতব্বরও আবহ পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য ক'রে নিতান্তই চুপ করে ছিল না, মাঝে মাঝেই চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠে নিজের

অস্তিত্বকে সে ঘোষণা করছিল। এতকালের শান্ত সেঁউড়িয়া একটা মুহূর্তে এসে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখতে গিয়ে বুক ভরে উঠলো সাকিনার। মনের মধ্যে গুনগুন শব্দে তার কেবলই গান বাজছিল—

'আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায় রে,
ও ধারার সনে আছে মানুষ ধরো সে ধারায় রে।'···

সেই অধরাকে ধরার সাধনা আজ থেকে তার শুরু।

এগারো

সেদিন বেশ ভোরে ভোরেই মাতব্বরকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লালন। আখড়ায় শিষ্যদের যা রোজগার, তার সঙ্গে তার নিজের রোজগার না মেশালে চলতো না। এখানে-ওখানে গান গেয়ে পয়সা সংগ্রহ করতে হতো তাকে। সেই রোজগারের উপর ইদানীং আরও কিছুটা বেশী মন দিতে হয়েছিল। সাকিনা ঘরে এসেছে, তার জন্যে বাড়তি কিছু খরচ না থাকলেও ঘরে লোক বাড়তি তো বটেই! অনেক দূর দূর গ্রামে গিয়ে তাই ঘুরে আসতে হতো লালনকে। সেদিনও বেরিয়েছিল, কিন্তু পথে এসে আজ আর কেন যেন রোজগারে মন গেল না। ঘুরতে ঘুরতে শিলাইদহে ঠাকুরদের কাছারি-বাড়িতে এসে নেমে পড়লো। সেঁউড়িয়া থেকে শিলাইদহ খুব একটা দূরপথ নয়। পাশ দিয়ে তার পদ্মা প্রবাহিত হয়ে গেছে। পদ্মার বুকে বজরা ভাসিয়ে জমিদারী তদারক করেন ঠাকুর-পরিবার। ঘাটে এসে বজরা লাগলে প্রজারা এসে পাড়ে ভিড় করে দাঁড়ায়। এ অঞ্চলে ঠাকুর-পরিবারের জমিদারীটা দেখবার মতো। যেমন জমিদার, তেমনি গুণী-মানী। হাতের কড় গুণে ঠাকুরদের নাম বলে দিতে পারে লালন। দ্বারকানাথের ছেলে মহর্ষি, তাঁর ছোট ছেলে রবি—রবীন্দ্রনাথ। যেমন কবি, তেমনি গাইয়ে। বয়স আর কত, খুব বেশী হলে চব্বিশ-পঁচিশ থেকে উনত্রিশ-ত্রিশ। উজ্জ্বল চেহারা, টানা টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, মুখে গোঁফ-দাড়ি কেবল পাক দিয়ে উঠেছে, বাবরি চুল, চমৎকার দেখতে। বললেন, 'ফকির সাহেব, গান করো, আমি তোমার

গান থেকে সুর নেবো। সব সুরকে আমি মিলিয়ে দেখবো—ভারতীয় সঙ্গীতের মূল প্রাণ কোথায়!'

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল লালন। বললো, 'সে কি ছোট্-ঠাকুরকর্তা, আপনি কত বড় মানুষ, আমার এমন কি গান যে আপনি সুর নেবেন?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার সুর যে বাংলার প্রাণের সুর! তুমি গাও, আমি ঐ সুরে গান বাঁধবো।'

—'গান বাঁধবেন?' বলে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বজরার গলুইয়ের উপর বসে এবারে প্রাণ খুলে গান ধরলো লালন; গাইতে গাইতে স্নান-খাওয়া ভুলে গেল সে। বজরার গলুইয়ে বসেই একসময় জমিদারী খানা উদরস্থ ক'রে বললো, 'এবারে আপনি একটা শোনান ভাই ঠাকুরকর্তা!'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আবার যখন দেখা হবে, শোনাবো। আজ শুধু তুমি গাও, বড় ভালো লাগছে তোমার গান।'

ঠাকুর-পরিবারের গুণী ছেলের প্রশংসা পেয়ে মনটা ভরে গেল লালনের। উত্তরে কিছু একটাও দ্বিরুক্তি না ক'রে আবার গানের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল সে। এমনি ক'রে কখন যে একসময় দুপুর গড়িয়ে গেল, কেউই তা টের পেলো না। যখন আখড়ায় ফিরলো, প্রকৃতির বুকে তখন বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে।

সারাদিন তার জন্যে সাকিনা না খেয়ে উপোসি ছিল। সেই উপোসি জঠর নিয়েই সারা দুপুর ঘর আর বার করেছে সে। শীতল আর ভোলাও বসে ছিল না। কোথাও গিয়ে সাঁইজির কোনো বিপদ হলো কিনা, ভেবে অস্থির হয়ে মরছিল সবাই।

এমনি সময় বাইরের খিড়কিতে মাতব্বরের গলা শোনা গেল। শীতল আর ভোলা দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়াতেই মাতব্বরের পিঠ থেকে নেমে লালন বললো: 'ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল, তাই না রে?'

শীতল আর ভোলা এবারে সমস্বরে বলে উঠলো, 'একে কি

একটু দেরি বলে? আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে গুরু-মা সারাদিন উপোসে আছেন। আমরাও ভেবে ভেবে অস্থির। ওদিকে কুমারখালি থেকে কাঙাল হরিনাথ ঠাকুর দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে এসে বসে আছেন। আমাদের এখানে আজ তিনি অতিথি। এসে অবধি কেবল আপনার কথাই বলছিলেন।'

ব্যস্ত হয়ে লালন জিজ্ঞেস করলো, 'হরিনাথ এসেছে, কী আনন্দের কথা! তাকে পরিচর্যার ত্রুটি হয়নি তো?'

—'আজ্ঞে ত্রুটি কেন হবে! আমাদের ঘরে বসে তারা বিশ্রাম করছেন।'

লালন বললো, 'তোরা বোধ করি হরিনাথকে আগে চিনতে পারিসনি, চিনবিই বা কী ক'রে? আমি যখন বৈষ্ণব-সাধনায় ঘুরে বেরিয়েছি, কাঙালের সঙ্গে আমার সেই প্রথম বন্ধুত্ব। এদেশে এরকম মানুষ হয় না। চল, দেখে আসি।' বলে শীতল আর ভোলার যুক্ত-ঘরে এসে প্রবেশ করতেই উভয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। লালন বললো, 'তুমি তবে এতদিনে আমার আখড়ায় পায়ের ধুলো দিলে হরিনাথ!'

হরিনাথ বললো, 'ভাবছিলাম—পায়ের ধুলো পায়ে নিয়েই আবার ফিরে যাবো কিনা, ইতিমধ্যে যাহোক তুমি এসে গেলে!'

লালন বললো, 'শুধু এসে গেলাম না, যখন তোমাকে পেলাম, তখন সন্ধ্যাবেলাটা আজ আর ব্যর্থ যেতে দেবো না; আঙিনায় আসর বসাবো, তুমি গাইবে, আমি গাইবো, শিষ্যরাও সবাই গাইবে।'

শুনে হরিনাথ কিন্তু আপত্তি করলো না।

লালন বললো, 'একটু অপেক্ষা করো ভাই, সারাদিন ছিলাম না, একবার বৈষ্ণবীকে দর্শন দিয়ে আসি।' বলে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো সে।

অভিমানে সাকিনা প্রথমটা কথাই বললো না, পরে রাগ কিছুটা কমে এলে বললো, 'আচ্ছা, এই যে তুমি এত দেরি ক'রে ফেরো, সেজন্যে ঘরে আর-পাঁচজন যে ভেবে মরে, সেটুকু কি তুমি বোঝো না?'

তার পাশে ব'সে সান্ত্বনার সুরে লালন বললো, 'ঠাকুরদের বজরা লেগেছে পদ্মায়। শিলাইদহে যেতেই ছোট্‌ঠাকুর ধরে বসলো—গান শোনাও। সেই গান শোনাতেই এত দেরি হয়ে গেল। ধরো ছোট্‌ঠাকুরের বয়সটাই বা কি, কিন্তু এই বয়সেই যা নামকরা কবি হয়ে উঠেছে, ভাবা যায় না। বললো—আমি তোমার গান থেকে সুর নেবো। কি খেয়াল বলো দিকি! বজরায় বসে তাকে গান শোনাতেই এই এত বেলা হয়ে গেল। ছোট্‌ঠাকুর নিজেও আমাকে অনেক কবিতা শোনালো। শুনলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যেতে সাকিনা। কী ভাব আর কী তত্ত্বকথা! এইটুকু বয়সেই যদি এই, বড় হয়ে এ ছেলে যে দুনিয়া জয় করবে! তার কথা ঠেলে ফেলে আমি উঠে আসতে পারলাম না সাকিনা। কিন্তু তুমি কেন তাই বলে উপোস দিয়ে থাকবে?'

সাকিনা এবারে কথা না বলে মাথা নিচু করে নিল।

লালন বললো, 'এই দেহ হচ্ছে খোদাতালার মস্‌জিদ, আমার মনের মানুষের মঞ্জিল। সেই দেহকে কষ্ট দিলে খোদাতালাই কষ্ট পান। এমনটা আর কোরো না।' বলে পা ছড়িয়ে বসে একটুকাল বিশ্রাম করলো লালন।

অর্ধজীর্ণ একখানি তালপাখা নিয়ে পাশে বসে তাকে হাওয়া দিতে লাগলো সাকিনা।

এমনি ক'রেই একসময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

খবর পেয়ে শিষ্যরা আগে থেকেই আঙিনায় একটি তুলসীমঞ্চকে কেন্দ্র ক'রে আসরের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। অল্পসময়ের মধ্যেই মুখে মুখে সংবাদটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকেই এসে ভিড় জমালো আঙিনায়। লালনের বার্ষিক মহচ্ছব (ভাণ্ডারা) ভিন্ন এমন ভিড় সচরাচর কারুর চোখে পড়েনি।

হরিনাথ বললো, 'এ গাঁয়ে ভক্তের সংখ্যা তো দেখছি কম নয়! কিন্তু ভক্তির সঙ্গে তামাসা মিশে নেই তো?'

লালন বললো, 'তামাসাও যে একরকমের ভক্তি। যে যে-পথ

দিয়েই আসুক, পথের শেষ যে এক জায়গাতেই, একই গোলকধামে !'

হরিনাথ বললো, 'কিন্তু তুমিও আমাকে কম গোলকধাঁধায় ফেলনি।'

—'মানে ?'

—'মানে—সেই যে কবে দেখা দিয়ে একটুখানি হৃদয় ছুঁয়ে এলে, তারপর সেই হৃদয়ের হৃৎস্পন্দন চলছে কি বন্ধ হয়েছে, আর খোঁজ নিলে না। এতদিনে খোঁজ ক'রে ক'রে আমিই এসে তোমার দরজায় হাজির হলাম।'

বিনয়ের কণ্ঠে লালন বললো, 'এ যে তোমার মতো মানুষেরই সাজে ভাই ! আমাদের সাধক মনটা যদি সাধন-ধনেই শুধু লিপ্ত থাকতো, তবে আর ভাবনা ছিল না ; কিন্তু তা তো নয় ! আমি আজও বিষয় ছেড়ে বিবাগী হতে পারলাম না। চিরকাল তাই সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরলো। সেই সংসারের দিকে মন দিতে গিয়ে চিরকাল আমার সংই সার হলো, সারতত্ত্ব আর জীবনে খুঁজে পেলাম না।'

হরিনাথ বললো, 'কি যে বলো, কিছু ঠিক নেই। তুমি যে সারাৎসার, তোমাকে কাছে না পেয়ে এতদিন মনে মনে আমি জ্বলে মরেছি।'

আঙিনায় বসে ততক্ষণে লোকগুলো হরির নাম স্মরণ করছিল।

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে লালন বললো, 'এবারে একবার ওদের সকলকে দেখা দাও, তোমাকে দেখতে সবাই এসে বসে আছে।'

হরিনাথ বললো, 'সে কি একটা কথা ! আমিই যে সকলের দেখা পাবো বলে ছুটে এলাম ! সবার মধ্যেই তিনি—সারা জীবন ডেকেও যাঁকে পেলাম না।' বলে হঠাৎ কেমন ভাবে বিভোর হয়ে আপন মনেই গেয়ে উঠলো—

হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'লো পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে।
(ওহে দীন দয়াময়)।

আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে,

(ওহে, আমায় কি পার করবে না হে, আমায় অধম বলে),

যারা পাছে এলো, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।...

তাকে সঙ্গে ক'রে এবারে আঙিনায় এসে বসলো লালন। একতারা আর খঞ্জনীর সুরে অগণিত ভক্তপ্রাণ ভক্তিগদগদ হয়ে উঠলো। বাতাসার লুট পড়লো চারপাশে। হরিনাথের কণ্ঠ থেমে যেতেই লালন গান ধরলো—

পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে।
ক্ষম হে অপরাধ আমার ভব-কারাগারে।
না হ'লে তোমার কৃপা সাধন-সিদ্ধি
কে করিতে পারে ?
আমি পাপী তাইতে ডাকি
ভক্তি দাও মোর অন্তরে !
পাপী-তাপী জীব তোমার,
না যদি কর হে পার
দয়া প্রকাশ ক'রে,
পতিতপাবন পাতকনাশা
বলবে কে আর তোমারে !
জলে-স্থলে সব জায়গায়
তোমার সব কীর্তিময়
বিবিধ সংসারে,
না বুঝে অবোধ লালন
পড়লো বিষম ঘোরতরে।

শিষ্যরাও কেউ নীরবে বসে ছিল না। মাঝে মাঝে তারা ধুয়া ধরে খঞ্জনী আর একতারাকে আরও মুখর ক'রে তুলছিল। কখনও নৃত্যে মেতে লীলাকিশোরের আরতি হচ্ছিল, কখনও শুধু একতারা আর খঞ্জনীর তালে তালে কেবল নৃত্য হচ্ছিল। ঘরের মেঝেয় শুয়ে সাকিনা প্রথমটা কান পেতে শুনছিল সব, তারপর অধিক রাত্রে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লো, তা সে নিজেও বুঝলো না। আঙিনা ছেড়ে একটি

লোকও কিন্তু উঠে গেল না। বাউলের প্রাণরসে তাদের প্রাণ তখন মেতে উঠেছে ; কারও দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে বুক ভেসে গেছে, সেদিকে কারওই লক্ষ্য ছিল না। একই সুরে একতারা বেজে চলেছে, খঞ্জনী বেজে চলেছে, নৃত্য চলেছে, গান চলেছে : একবার হরিনাথ, একবার লালন।—'তোমার গোলকধাম থেকে নেমে এস গিরিধারী, মনের মানুষ মনে এস, নয়নমণি নয়নে এস। তোমার বিশ্ব-বিমোহিত রূপ নিয়ে দেখা দাও মুর্শিদ, দেখা দাও, দেখা দাও—।

মুর্শিদ আমায় ফেলো না, চরণ দিতে ভুলো না (গো),
আমি পদে পদে অপরাধী গো,
আমার বাদী রিপু ছয়জনা !…'

এমনি করেই সারা রাত কেটে গেল। কখন প্রহরে প্রহরে রাত্রিজাগা পাখিরা হাঁক দিয়ে গেছে, কখন আকাশের ক্ষীণ চাঁদ ম্লানমুখে ডুবে গেছে, কারও লক্ষ্যে পড়েনি। গানে, নৃত্যে, খঞ্জনী আর একতারার সুরে রাত্রির তপস্যা একসময় ভোরের প্রার্থনা হয়ে জেগে উঠলো।

ভোর হলো। সারা আকাশ উজ্জ্বল ক'রে জেগে উঠলো তরুণ সূর্য।

বারো

ভোর হলো। সারা আকাশ উজ্জ্বল ক'রে জেগে উঠলো তরুণ সূর্য। তখনও ভাবে বিভোর হয়ে সুরের মধ্যে মিশে আছে লালন আর হরিনাথ। এমনি ক'রে আরও যে কতক্ষণ কাটলো, বলতে পারি না। যখন সংবিৎ ফিরলো, দেখলো—রোদে চারদিক ছেয়ে গেছে। ওপাশ থেকে মুহুর্মুহুঃ মাতব্বরের গলা ভেসে আসছে– চিঁ-হিঁ-হিঁ—চিঁ-হিঁ-হিঁ—। ক্ষিদে পেয়েছে ; অন্যান্য দিন এমন সময় প্রচুর খাবার পায় সে। আজ সে-সময় উত্তীর্ণ। বুঝতে পেরে শীতল সা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলো মাতব্বরকে। আড়াল থেকে ভোলা সা-কে একবার ইশারায় ডেকে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে সাকিনা বললো, 'নাস্তা তৈরী ক'রে রেখেছি ; তোমাদের সাঁইজি ঘরে

গিয়ে বসলে নিয়ে গিয়ে দিও। সঙ্গে তোমরাও সবাই জলপানি খেয়ে নিও।'

সারারাত নামগান ক'রে এখন কেমন নিজেকে পাগল পাগল লাগছিল ভোলা সার; চোখ দু'টো ক্লান্তিতে বুজে আসছিল। সেই অবস্থাতেই কোনোভাবে সে গুরু-মার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই তো সবে আসর ভাঙলো, এবারে হাত-মুখ ধুয়ে সবাই গিয়ে বসবেন।'

—'সময়মতো তা হলে এসে নিয়ে যেয়ো।'

—'যাবো।' বলে পুনরায় আঙিনার দিকে পা বাড়ালো ভোলা সা।

সাকিনা যে নতুন কোনো কাজে মন দিল, এমন নয়। রাত্রে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, এখন তা মনেও আনতে পারলো না। কিন্তু একটা কথা কেবলই বার বার তার মনকে পীড়া দিতে লাগলো। যার সেবার জন্যে সে নিজেকে অঞ্জলি ক'রে তুলে ধরলো, সে চির-কালের ঘরবিবাগী। যেটুকু সময় আখড়ায় থাকে লালন, আপন মনে গান গেয়ে কাটিয়ে দেয়, নয়তো শিষ্যদের ডেকে ধর্ম-উপদেশ দেয়, বাকী সময়টা একতারা হাতে নিয়ে ভিক্ষেয় বেরোয়। সাধ মিটিয়ে একটুক্ষণের জন্যেও যদি তাকে কাছে পায় সাকিনা! এ কি কম দুঃখ তার? অথচ সে দুঃখ সে মুখ ফুটে কাউকে প্রকাশ করতে পারলো না। তার ফুপুর যেবার বিয়ে হলো, বিয়ের দু'মাসের মধ্যে তার পেটে সন্তান এলো। আর তার নিজের? বিয়ে হয়ে অবধি এতকালের মধ্যেও একবার দু'বাহুর মধ্যে পেলো না সে লালনকে। যখনই কাছে টানতে গেছে, লালন বলেছে—আমরা মনের কারবারী, তাইতো দিনরাত মনের মানুষকে খুঁজি, আমার এই দেহের মধ্যে যেমন, তোমার দেহের মধ্যেও তেমনি সেই অচিন পড়শীর বাস। দেহ তাইতো দেব-দেউল, তাকে কি কখনও অপবিত্র করা যায়! তুমি ঘুমোও, দেখবে—মন ঠিক হয়ে গেছে।'

সেই ঘুমকেই দীর্ঘ-প্রলম্বিত ক'রে চেয়েছিল সাকিনা। একটানা

ঘুমোতে পারলেই হয়তো বিস্মৃতিলোকে শান্তি পেতো সে, কিন্তু তাই বা পারলো কোথায় ? ফকিরের সেবা করতে এসে চিরকাল সে বন্ধ্যা হয়েই থাকবে, লোকে তাকে বন্ধ্যা বলবে, আব্বা আটকুড়া বলবে, বলবে সেই বা নিজেকে নিজে কম কি।

আর ভাবতে পারলো না সাকিনা। মাথাটা কেমন ঘোরাচ্ছিল, মেঝের ঠাণ্ডা মাটিতে একবার গা'টাকে এলিয়ে দিল সে।...

এদিকে একটু একটু ক'রে বেলা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। সকালের জলপানি মুখে দিয়ে একসময় নিজের ঘরে উঠে এলো লালন।

তখনও তেমনি ক'রেই মাটিতে পড়ে আছে সাকিনা।

কাছে এসে বসে লালন বললো, 'রাত্তিরে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তাই না গো ?'

কিন্তু একথার কোনো জবাব দিল না সাকিনা।

একটুকাল থেমে পুনরায় লালন বললো, 'তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো সাকিনা ?'

অভিমানের কণ্ঠে এবারে সাকিনা বললো, 'এ শরীর খারাপ হলেই বা কে দেখছে ?'

—'কেন, আমি রয়েছি, শীতল আর ভোলা রয়েছে ; কে না দেখবে গো!' থেমে লালন বললো, 'উঠে বসবে না, কথা বলবে না আমার সঙ্গে ?'

—'কেন, এই তো বলছি। কি দরকার বলো ?'

লালন বললো, 'তোমার সঙ্গে কি আমার শুধু দরকারেরই সম্পর্ক, মনের সম্পর্ক কিছু নেই ?'

সাকিনা বললো, 'মন তো নিয়েছই, আবার কেন ?'

—'কিন্তু মনের মানুষকে যে আজও পাই নি! তুমি আমার ফকিরাণী, আমার ব্রহ্মাণী, ভৈরবী, বৈষ্ণবী। তোমার মধ্যেই তো আমি খুঁজে পাবো আমার খোদাতালাকে, আমার গিরিধারীলাল আর গোরাকে। তুমি যে আমার সেই দিব্যপথের ধ্রুবতারা!' বলে একটুকাল থামলো লালন, তারপর বললো, 'ওঠো, উঠে বসো। আমাকে আবার ও-ঘরে

যেতে হবে। হরিনাথ বলছিল—এ বেলাই চলে যাবে; আমি তাকে আরও দু'টো দিন থাকতে বলেছি। আবার কবে দেখা হবে, আদৌ দেখা হবে কিনা, কিছু তো জানি না! ওকে দেখলে মনে হয়—সত্যিকারের সাধক। ওর-মতো আজও আমি অমন ক'রে মাতাল হতে পারিনি। বলছিল—ওর সঙ্গে কুমারখালি যেতে, একবার না গেলে অন্যায় হয়।'

এবারে মাথা তুলে উঠে বসলো সাকিনা, বললো, 'বেশ তো, যাও না, গিয়ে সৌজন্য রক্ষা করে এস।'

—'এখন যাবার আমার সময় কোথায়, তা ছাড়া দেহটাও যে ভালো নেই।' থেমে লালন বললো, 'ইদানীং মনে হচ্ছে যেন বয়স বাড়ছে, ক্রমেই যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি!'

শুনে অপাঙ্গে একবার নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে সাকিনা বললো, 'আমিও বোধ করি তবে বুড়ী হয়ে গেছি!' বলতে গিয়ে বুকের ভিতরটা আর একবার হু-হু ক'রে উঠলো সাকিনার। যদি বুড়ীই হবে সে, তবে আর মিথ্যে মনে মনে পার্থিব কামনায় জর্জরিত হচ্ছে কেন সে? এ ভুল, এ তার ভুল, সে তো নিজেকে ভোগ করার জন্যে ফকিরকে চায়নি, ফকিরকে সেবা করতে পারবে বলেই যে তার গানে মুগ্ধ হয়ে একদিন এঘরে এসেছিল সে। তা কি কখনও মিথ্যে হতে পারে? হঠাৎ কেমন একটা আত্মদর্শন খুঁজে পেয়ে লালনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল সাকিনা।

লালন বললো, 'তুমি বুড়ী হবে কোন্ দুঃখে! আমরা যে চির-যৌবনের সাধক গো! তুমি আমার সেই যৌবনের প্রতীক। তুমি কেন বুড়ী হবে?'

উত্তরে কি যেন একটা বলতে গেল সাকিনা, কিন্তু পারলো না।

লালন বললো, 'উঠি, ওদিকে হরিনাথ নইলে একা হয়তো ভাববে!' বলে সাকিনার পাশ থেকে এবারে উঠে পড়লো লালন।

কিন্তু হরিনাথের দরজা অবধি গিয়ে আর পৌঁছানো সম্ভব হলো না তার পক্ষে। একটি সেবাইতকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এসে শীতল সা দাঁড়ালো। সেবাইতটি আর কেউ নয়, গুপ্ত মিত্রের আখড়ার নিত্যানন্দ।

চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো ছলছল করছে। তাকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছিল লালন, বাধা দিয়ে নিত্যানন্দ বললো, 'একদিন আনন্দ নিয়ে এসে আপনার নামগান শুনে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সে আনন্দ আজ মাটি হয়ে গেল।'

ব্যস্তকণ্ঠে লালন জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, সে কি কথা?'

নিত্যানন্দ বললো, 'বড় দুঃসংবাদ নিয়ে আমাকে ছুটে আসতে হলো।'

—'কেন, কি ব্যাপার? আমার মা'র কিছু হয়নি তো?' বলতে গিয়ে বুকের ভিতরটা অলক্ষ্যে কেমন যেন একবার কেঁপে উঠলো লালনের।

জবাব দিতে গিয়ে এবারে মাথা নিচু ক'রে নিল নিত্যানন্দ।

উতলা হয়ে লালন জিজ্ঞেস করলো: 'কি, কথা বলছো না যে!'

এবারে অশ্রুসজল চোখ দুটোকে একবার মুহূর্তের জন্য লালনের মুখের দিকে তুলে ধরে আর্দ্রকণ্ঠে নিত্যানন্দ বললো: 'কাল ভোরে তিনি দেহ রেখেছেন; সৎকার ক'রে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল বলে আজ ভোরে উঠেই আপনাকে খবরটা পৌঁছে দিতে ছুটে এলাম।'

শুনে চোখ দুটো হঠাৎ কেমন স্থির হয়ে গেল লালনের। বললো, 'মা তবে আর নেই?'

আড়ালে শীতল একবার চোখ দুটোকে মুছে নিল।

নিত্যানন্দ বললো, 'আমাদের কাছেও তিনি মায়ের মতোই ছিলেন। আজ শুধু আপনি নন সাঁইজি, মাতৃহীন যে আমরাও হলাম!'

কথা বলতে গিয়ে গলাটা এবারে ধরে এলো লালনের। ধীরে ধীরে একখানি হাত নিত্যানন্দের ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রসারিত ক'রে সে বললো, 'তোমরাও তবে দেবী ভগবতীর স্নেহ পেয়েছিলে?'

নিত্যানন্দ বললো, 'সত্যিই তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন। একটা দিনও তিনি বুঝতে দেননি যে, আমরা তাঁর পেটের সন্তান নই!'

ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে হরিনাথ কাছে এসে বললো, 'চলো, ঘরে

গিয়ে বসবে লালন, ঘরে এসে বসে সব শোনো।' বলে লালনের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো হরিনাথ।

দু'চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছিল লালনের। জিজ্ঞেস করলো, 'মা কি সজ্ঞানেই গেছেন, না যাবার আগে জ্ঞান ছিল না?'

নিত্যানন্দ বললো, 'সজ্ঞানে ঠাকুরের নাম করতে করতেই চোখ বুজলেন। একবার বলেছিলেন, লালনকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এই বলে সেই যে চুপ করলেন, আর কথা বলেননি।'

—'আমি অধম সন্তান, মাকে একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পারলাম না। আমার মতো পাপী আর এ সংসারে কে আছে?' বলে একবার ডুকরে কেঁদে উঠলো লালন।

সান্ত্বনা দিয়ে হরিনাথ বললো: 'তুমি না সংসার-বিবাগী, তুমি না সুখ-দুঃখ সবকিছুর বাইরে! তবে কেন তোমার চোখে জল লালন? চোখ মোছ, স্থির হয়ে বসো। যে জননী আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁতে আর গিরিধারীলালে কি কিছু তফাৎ আছে? জীবাত্মা আজ পরমাত্মায় রূপ নিয়েছে। এ শুধু রঙের খেলা। আকাশে যেমন রং বদলায়, এও তেমনি। জীবদেহে যিনি সমাজে থেকে তোমার কাছ থেকে সরে ছিলেন, সূক্ষ্মদেহে সমাজের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে তিনি আজ তোমার কাছে এগিয়ে এলেন! আজ থেকে যে মাকে তুমি আরও বেশি করে পাবে। মনের মধ্যে খুঁজে দেখ লালন, দেখ—পেয়েছ কিনা!'

ধীরে ধীরে চোখের জল একসময় শুকিয়ে এলো লালনের। নিত্যানন্দের একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে কাতর-কণ্ঠে বললো: 'মার জন্যে এ জীবনে আমি কিছু করতে পারিনি, এমনকি নিজের হাতে তাঁর সৎকারটাও করতে পারলাম না। আমার কাজ তুমিই করেছ নিত্যানন্দ। তুমিই সত্যিকারের সন্তান। উপযাচক হয়ে আমি যে মা'র পারলৌকিক কাজ করবো, এমন অধিকারটুকুও আজ আমার নেই। এখানে আমার যা পুঁজিপাটা আছে, তুমি নিয়ে গিয়ে কাজকর্ম করিয়ে গ্রামবাসীদের নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ো। লোক-

জনকে খাওয়াতে বড় ভালোবাসতেন মা। তাঁর পারলৌকিক কাজে কেউ যেন বাদ যায় না ভাই দেখো।' বলে শীতলকে কাছে ডেকে বললো, 'অর্থকড়ি যা আছে, নিত্যানন্দের হাতে তুলে দে শীতল, আমার হয়ে ও-ই সব করবে।'

শীতল একদণ্ডও আর অপেক্ষা না ক'রে আখড়ায় মজুত যা টাকা ছিল, এনে নিত্যানন্দের হাতে তুলে দিল।

বিদায় নিয়ে এবারে নিত্যানন্দ বললো, 'আজকের মতো আমি তা হ'লে আসি সাঁইজি। কি হলো না হলো, একসময় এসে আমি জানিয়ে যাবো।'

বাধা দিল না লালন, বললো: 'তাই এসো।' বলে নিজেও আর বসে না থেকে অশ্রু গোপন ক'রে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তের

কাঙাল হরিনাথের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। একদিন সে সেঁউড়িয়া থেকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তখনও তার কথাগুলি বড় গভীর হয়ে লালনের মনে বাজছিল: 'যে জননী আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁতে আর গিরিধারীলালে কি কিছু তফাৎ আছে? জীবাত্মা আজ পরমাত্মায় রূপ নিয়েছে। এ শুধু রঙের খেলা। আকাশে যেমন রং বদলায়, এও তেমনি।'

কিন্তু সব বুঝেও মনটা যেন কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না। একদিন দয়া চক্ষু বুজে গেল, আজ গেলেন মা। জীবনটা কোথা থেকে কবে শুরু হয়েছিল, আজ আর তা মনে পড়ে না। কিন্তু মায়ের প্রতিদিনের প্রতিটি কথা এখনও স্পষ্ট তার মনে বাজে। মা যেমন ক'রে তাকে ভালোবেসেছিলেন, এমনটি বুঝি কোনো মা কোনো সন্তানকে বাসেন না। ভাবতে গিয়ে আর একবার চোখে জল এলো লালনের। এ জীবনটা শুধু শোক আর সংগ্রাম ক'রেই কাটলো। জীবন-সাধনা আর হলো না। শেষবার দেখা করতে গেলে মা বলেছিলেন:

'গোবিন্দ আমাকে তাঁর পায়ে টেনেছেন। এ দেহ আর বেশিদিন নেই। এসে এসে দেখে যেতে যেতে কবে দেখবি আমি আর নেই।' সেই যাওয়াও আর তার হয়নি, মাও আর নেই। জীবাত্মায় আর পরমাত্মায় আজ বুঝি সত্যিই মাখামাখি হয়ে গেল। হাত জোড় ক'রে তার কল্পনার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা তুলে ধরলো লালন: 'হে অচেনা, মহা আলোকের পথের ওগো আমার সাধনমনের মানুষ, তুমি যেন মা'র আত্মার কল্যাণ কোরো। আমার কসুর যেন তুমি নিও না। মানুষকে দিয়ে সব খেলাই যে তুমি খেলাচ্ছ! ওগো খেলার গুরু, এ পৃথিবীর খেলা কি আমারও সাঙ্গ হলো না? নাও, আমাকেও তুমি টেনে নাও।'

কখন থেকে এসে সাকিনা ঠায় পাশে দাঁড়িয়ে ছিল. এবারে নিঃশব্দে কোথায় একদিকে আবার চলে গেল। এ ক'দিন ধরে অনেক কথাই তার মনে এসেছিল, কিন্তু একটি কথাও সে লালনকে খুলে বলতে পারছিল না। পদ্মাবতীকে নিজে সে কোনোদিন চোখে দেখেনি। লালনের মুখে শুধু একদিন মাত্র শুনেছিল—গৃহহীনা তিনি সন্ন্যাসিনী। তাতেই তাঁর সমগ্র রূপটি সে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল, বাকীটুকু দেখেছিল লালনের চোখ দিয়ে। আজ স্বামী তার মাতৃহীন, এ দুঃখ কি সাকিনার মনেই কম বাজছিল! অথচ স্বামীকে যে দু'টো কথা বলে সান্ত্বনা দেবে সে, তা পারছিল না, মুখে কথা এসেও হারিয়ে যাচ্ছিল। বারবার কাছে এসে বারবার তাই ছুটে পালাচ্ছিল সে।

সেদিকে বোধ করি লালনের লক্ষ্য ছিল না। আপন ভাবে বিভোর হয়ে কেবলই সে গান করছিল—

পাখী কখন যে উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়!
খাঁচার আড়া পড়লো ঢসে,
পাখী আর উড়বে কিসে?
এই ভাবনা ভাবচি ব'সে,
চমক জরা বইছে গায়।

ভেবে অন্ত নাহি দেখি
কার বা খাঁচায় কে বা পাখী,
আমার এ আঙিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়।
আগে যদি যাইত জানা
জঙ্গলা কভু পোষ মানে না,
তবে উহার প্রেম করতেম না
লালন ফকির কেঁদে কয়।

গাইতে গাইতে নিজের মনেই একসময় উঠে পড়লো সে। এসে সোজা মাতব্বরের সামনে দাঁড়াতেই সোচ্ছ্বাসে একবার চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠলো মাতব্বর।

লালন বললো, 'চল, ঘুরে আসি। মাকে তো আর পাবো না, অফুরন্ত প্রকৃতি আজ মা হয়ে দিগন্ত বিস্তার ক'রে ছড়িয়ে আছে। চল, একবার সেই মায়ের বুকের ছোঁয়া নিয়ে আসি।' বলে মাতব্বরের পিঠে চেপে বসলো লালন।

লক্ষ্য ক'রে ভোলা সা কাছে এসে বললো, 'এই বয়সে শরীর খারাপ নিয়ে আপনি এভাবে একা একা যাবেন সাঁইজি?'

লালন বললো, 'বয়সটা কিছু হলো, তাই না রে? এ বয়সে লোকে আর বাঁচে না। কিন্তু তোর ভয় নেই, আমি মরবো না। তুই বরং যা, গুরু-মার কাছে গিয়ে বস।' বলে আর অপেক্ষা করলো না লালন, মাতব্বরকে বললো, 'চল।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করলো মাতব্বর।

ভোলা সা এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালো না; সোজা সে সাকিনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'সাঁইজিকে আপনি বেরোতে দিলেন কেন গুরু-মা? মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও ভেঙে পড়েছে সাঁইজির। আমরা তাঁকে জোর ক'রে আটকাতে পারি না, কিন্তু আপনি তো পারেন!'

সাকিনা বললো, 'আমিও না। তোমার সাঁইজি কি কারও বারণ শোনেন যে, আটকাবো?'

ভোলা সা বললো, 'বারণ না শোনেন, কথা বলে গল্প করেও তো ভুলিয়ে রাখতে পারেন ?'

সাকিনা বললো, 'তোমাদের সাঁইজিকে ভুলিয়ে রাখবো আমি, তবেই হয়েছে! যে নিজেই আত্মভোলা, তাকে ভোলাবে কে ?'

দাওয়ার একপাশে বসে এবারে ভোলা সা বললো, 'আপনি যদি গাইতে জানতেন গুরু-মা, তবে খুব ভালো হতো।'

—'কেন ?'

—'গান পেলে সাঁইজি সব ভুলে যান।' থেমে ভোলা সা বললো, 'সাঁইজির নিজের গানেরই কি তুলনা আছে! লোকে বলে—এদেশের মানুষ একদিন সব ভুলে গেলেও সাঁইজির গান ভুলবে না। তাঁর পায়ে ঠাঁই পেয়ে আমরা বাংলাদেশের সেই চিরকালের খাঁটি মানুষটিকে দু'চোখ ভরে দেখলাম, এ কি আমাদের কম ভাগ্য !'

সারা বুকখানিকে আচমকা ঢেউ দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সাকিনার। বললো, 'তাকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমার নিজের জীবনটাও কি কম সার্থক হলো ভোলা। মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কথা ভাবতে গিয়ে দুঃখ পাই যে, এমন গুণী সাধক-কেও এ বয়সে ভিক্ষেয় বেরোতে হয় !'

আক্ষেপের কণ্ঠে ভোলা সা বললো, 'সংসারে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না গুরু-মা, কেউ বোঝে না। একদিন এদেশের গণ্যমান্যেরা সাঁইজির গান নিয়ে মেতে উঠবে। দুঃখের বিষয়, সেদিন হয়তো আমরা কেউ আর এ পৃথিবীতে থাকবো না !'

সাকিনার মুখে এবারে কথা ফুটলো না।

এমনি ক'রে কিছুক্ষণ কেটে গেলে একসময় নিজে থেকেই আবার উঠে পড়লো ভোলা সা, বললো, 'ওদিকে অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে, এবারে উঠি গুরু-মা।'

—'এস।' বলে সাকিনাও আর অপেক্ষা করলো না। তার হাতেই কি কাজ কিছু কম ? সেই কাজের মধ্যেই এবারে মনটাকে ডুবিয়ে দিল সে।...

চির সবুজ প্রকৃতি তার অপার ঔদার্যে দিগন্ত বিস্তার ক'রে পৃথিবীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। মাতব্বরকে নিয়ে সেই হাসিমুখ দর্শন করছিল লালন। দর্শন করছিল, আর ভাবছিল—কি সুন্দর নিয়মে, কি অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রকৃতি তার আপন লীলায় লীলায়িত হয়ে চলেছে? কে সেই অসীম শক্তি—যিনি সকলের অলক্ষ্যে থেকে অবিরত তাকে এমন সুন্দরভাবে চালনা করছেন? কে? কে তিনি? কে সেই দয়াল—যাঁর দয়ায় এত বড় পৃথিবীর একদিনের সন্তাপ আর-একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, একদিনের বিরহ চিরদিনের মিলনের বীণা হয়ে বাজে?—'দয়াল, কোথায় তুমি দয়াল?' বলতে বলতে আপন মনেই গেয়ে উঠলো লালন—

দয়াল তোমায় বৈ আর জানি না, তোবা গাছের সন্ধান পেলেম না।
হাদিছে খবর আছে, তোবাগাছ উবধভাবে, সে গাছের
লাখ লাখ শিকড়,
শিকড় কাটলে গাছ মরে—হুতাশে প্রাণ বাঁচে না।
হায়াত মাউত তার পাতে লেখা আছে, গাছ তার চামে ঢাকা।
সে গাছের গোড়া পানির ভিতরে আজরাইল বসে,
ডালে দৃষ্ট করে দেখে পাতা থাকে না।
লালন কয় গাছের তরে গাছ আছে শূন্যভরে,
সে গাছের তুলনা চলে না;
প্রত্যেক দিন সে আহার করে আমি খুঁজে পেলেম না।

গাইতে গাইতে একসময় আবার সে শিলাইদহে ঠাকুরদের কাছারিবাড়ির সামনে এসে থেমে পড়লো। কাছারিঘরে কে একজন মধ্যবয়সী লোক ব'সে কাজ করছিল, তাকে সেলাম দিয়ে লালন জিজ্ঞেস করলো: 'কই গো, আমার ছোট্‌ঠাকুরকর্তা কই, আমি যে তাঁর গান শুনতে এলাম; তিনি আমাকে গান শোনাবেন বলেছিলেন।'

মধ্যবয়স্ক লোকটি বললো, 'বলেছিলেন বুঝি? তা—কবে আসতে বলেছিলেন?'

—'কবে আবার কি, যবে দেখা হবে, তবে।' লালন বললো, 'কোথায়, ছোট্‌ঠাকুরকর্তাকে যে দেখতে পাচ্ছি না?'

হাতের কলম থামিয়ে মধ্যবয়স্ক লোকটি বললো, 'এখানে থাকলে তো দেখবে! তিনি এখন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেখানে সেজো গিন্নীমা গত হবার পর থেকে সংসারে তো শোকতাপ একটা-না-একটা লেগেই আছে! তোমার ছোট্‌ঠাকুরকর্তার মনে তাই শান্তি নেই। তিনি থাকলেই কি আর তোমাকে মন খুলে গান শোনাতে পারতেন, তা বোধ করি পারতেন না!'

মনের কোথায় যেন গিয়ে এবারে কথাটা বড় বিঁধলো! একটুকাল আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ব্যথাকাতর-কণ্ঠে লালন বললো: 'শোকতাপ, সংসারে তবে এমন কোনো জায়গা নেই—যেখানে শোকতাপ নেই! ছোট্‌ঠাকুরকর্তার অমন সুন্দর মনেও তবে দাগ বসেছে!'

মধ্যবয়স্ক লোকটি এবারে কি বলবে, সহসা বুঝে উঠতে পারলো না।

মাতব্বরকে নিয়ে এবারে পদ্মার পথে পা বাড়ালো লালন।

ব্যস্ত হয়ে মধ্যবয়স্ক লোকটি বললো: 'কি, চললে নাকি ফকির সাহেব? তা—ছোট্‌ঠাকুরকর্তা না হয় এখানে নাই-বা আছেন, আমরা তো আছি, আমাদেরই কি গান কিছু কম ভালো লাগে! বসে বসে গাও না শুনি! তোমার আখড়ার জন্যে না হয় তোমার ঝুলিতে কিছু দিয়ে দেবো!'

এবারে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে লালন বললো: 'আমি ভিক্ষে করি সন্দেহ নেই, কিন্তু পয়সার বিনিময়ে বিলোবার মতো গান নয় আমার। মাপ করুন।' বলে একদণ্ডও আর অপেক্ষা না ক'রে সোজা সে পদ্মার পাড়ে এসে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই। শোক, তাপ, দুঃখ আর হাহাকার অনবরত চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই শোকের পৃথিবীতে প্রকৃতি এমন প্রফুল্লবদনা হলো কি ক'রে? পদ্মার দিকে

তাকিয়ে অনেকক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে সে বসে রইল। আজ আর এ ঘাটে ঠাকুরকর্তার বজরা বাঁধা নেই, বজরার গতি হয়তো আজ অন্যদিকে। পদ্মা এখানে শান্ত, মানুষের শোকের দুর্বহ ভার নিয়ে আজ হয়তো সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে! পদ্মার সেই শান্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে একবার উচ্চারণ করলো লালন: 'হায় খোদাবন্দ, একদিন আমার জড়দেহে তুমি চেতনা এনে দিয়েছিলে, আজ আবার তুমি আমাকে তোমার শান্ত বুকে টেনে নাও। আমার বাকি দিনের একটা পাতাও যে আজ আর খরচের নেই!' তারপর আপন খেয়ালেই একসময় সে গেয়ে উঠলো—

বাকীর কাগজ গেল হুজুরে।

আল্লা কোন্ দিনে দিন আসবে শমন সাধের সন্তোষপুরে।
যেদিন ভিটায় হয় বসতি, দিয়াছে মন খোস কবলতি,
আমি হরদমে নাম রাখিব স্থিতি এখন সে নাম ভুলে যে খলে
আইন মাফিক নিরিখ দেনা, তাতে কেন তোর ইতরপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা, জানা যাবে আখেরাতে।
সুখের পেলে হয় সুখের ভোলা, দুখ পেলে দুখের উতলা,
ফকির লালন কয় সাধের বেলা সাধন কিসে জোর ধরে।

গাইতে গাইতে কখন যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছিল, লক্ষ্য ছিল না লালনের। এই অন্ধকারকেও যেন এই মুহূর্তে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে ভালো লাগে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। মাতব্বর একবার ডেকে উঠলো: চিঁ-হিঁ-হিঁ—।

উঠে পড়ে লালন বললো: 'অন্ধকারকে তোর বড় ভয়, তাই না রে! চল, বুঝেছি, তোর ক্ষিদে পেয়েছে; ঘরে গিয়ে চানা খেয়ে তবে ঘুমোবি, চল।' বলে মাতব্বরের পিঠে আবার চেপে বসলো লালন।

আর একবার ডেকে উঠলো মাতব্বর—'চিঁ-হুঁ-হিঁ'— তারপর সোজা সেঁউড়িয়ার পথে পা বাড়ালো।

চৌদ্দ

ঘরের মেঝে থেকে দাওয়ায় পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ সেদিন পড়ে গেল লালন। পড়ে গিয়ে পায়ের খানিকটা জায়গা ছড়ে গেল। ঘরের আড়ালে বসে কী একটা করছিল সাকিনা, শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তুলে ধরলো লালনকে, জিজ্ঞেস করলো: 'এমনি ক'রে হঠাৎ তুমি পড়ে গেলে কি ক'রে?'

কথা বলতে গিয়ে বুক কাঁপছিল, গলা কাঁপছিল, তবু ধীরে ধীরে লালন বললো, 'উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ কেমন ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলাম; এমন কিছু হয়নি, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

সাকিনা বললো, 'ঠিক হয়ে যাবে বলেই তবে তুমি টাল সামলাতে পারোনি? শরীরে যে কিছু নেই, সেটুকু তো একবারও চোখে পড়ে না, শুধু পারো বাচ্চাদের মতো ছুটোছুটি করতে! আর তুমি মাতব্বরের পিঠে চড়ে দূরে কোথাও বেরোতে পারবে না।'

ততক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছিল লালন, বললো, 'ছুটোছুটি যে করবো না বলো, এখানে কি সবাই মিলে উপোস দিয়ে মরবে? আমি বেরোলে তবু কিছু আনতে পারি; শীতল বলো, ভোলা বলো, মাণিক, কুধু, আর মহরম সা বলো, ওরা গিয়ে কি তা পারে? অথচ ওরা এখানে আমারই মুখ চেয়ে রয়েছে।'

—'তাই বলে এম্‌নি ক'রে তুমি বেরিয়ে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত কিছু একটা অনর্থ ঘটাবে?' সাকিনা বললো, 'ওরা যা পারে, তাই এনেই আখড়া চালাবে, এই নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। গায়ে যার একফোঁটা রক্ত নেই, সেই মানুষ যে কি ক'রে রোদে-জলে ভিজেপুড়ে ঘর আর বার করে, ভাবতেও অবাক লাগে। কিছুদিনের মধ্যে তুমি আর একটিবারও ঘর থেকে বেরোতে পাবে না। আগে শরীর ভালো হোক, তখন বুঝবো।'

মুখে ঈষৎ হাসির রেখা টেনে লালন বললো, 'আমার মা-ও ঠিক তোমার মতো এমনি ক'রে বলতো। তখন মা বুড়ো ছিল, আর আমি ছিলাম জোয়ান মর্দ, আজ আমি বুড়ো হয়েছি, আর তুমি প্রৌঢ়া।

বুড়ী মার কাছে সেদিন আমি যেমন সমস্যা ছিলাম, আজ তোমার প্রৌঢ়ত্বের কাছে আমি ঠিক তেমনি সমস্যাই আছি। কখনও তোমাকে আমি ভৈরবী ভেবেছি, কখনও ভেবেছি বৈষ্ণবী, কখনও তোমাকে দেখেছি তন্ত্রে-পুরাণে, কখনও হাদিছে। কিন্তু তোমার এমন সুন্দর মাতৃরূপ কখনও দেখিনি। স্ত্রী হয়ে যেখানে তুমি চোখের জল ফেলেছ, মা হয়ে সেখানেই তুমি আদেশ করেছ। তোমরা এই মেয়েজাতটা যে কত বিচিত্র আর কত বড়, মাঝে মাঝে তাই ভেবেই অবাক লাগে সাকিনা।'

উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল সাকিনা, ইতিমধ্যে সামনে এসে দাঁড়ালো শীতল সা। তাকে লক্ষ্য ক'রে এবারে সাকিনা বললো, 'কিছু গাঁদাপাতা আনো তো চট্ ক'রে! তোমার সাঁইজির পা-টা একবার দেখেছ? গাঁদাপাতা চটকে লাগিয়ে না দিলে এ আর শীগ্গির সারবে না।'

কোনো প্রশ্ন না তুলে শীতল তা-ই করলো। সঙ্গে সঙ্গে হাতের তেলোয় গাঁদাপাতা চিপ্ড়ে লালনের ক্ষতস্থানটায় লাগিয়ে দিল সাকিনা।

শীতল বললো, 'এতক্ষণ আমাদের ডাকেননি কেন গুরু-মা?'

সাকিনা বললো, 'আমি একাই পেরে গেলাম বলে তোমাদের আর ইচ্ছে করেই ডাকিনি।'

লালন বললো, 'তুই একটু আমার কাছে এসে বস শীতল, দেখবি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবো।'

শীতল বললো, 'তার চাইতে ঘরে গিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করবেন চলুন।' বলে লালনের কোনো আপত্তি কানে না তুলে এবারে তাকে ধরে নিয়ে ঘরে শুইয়ে দিল শীতল, তারপর তার পাশে বসে তালপাখা নিয়ে ধীরে ধীরে মাথায় বাতাস করতে লাগলো।

লালন বললো, 'তোদের এত সেবাও আমার ভাগ্যে ছিল! এই সেবা ফেলে কারও এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে? অথচ আমার রোজ-কেয়ামতের দিন বোধ করি আর খুব বেশি দূরে নয়!'

ইচ্ছে ক'রেই কথাটা শুনলো না সাকিনা, কোথায় একদিকে

আবার চলে গেল।

শীতল বললো, 'মাটির এই পৃথিবী ছেড়ে সকলকেই একদিন যেতে হবে সাঁইজি, সে কথা ভেবে আজ লাভ নেই। আমি বসে বসে হাওয়া দিচ্ছি, আপনি একটু ঘুমোন দিকি!'

এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে চোখ বুজে মনে মনে কি একটা গানের কলি ভাঁজতে লাগলো লালন, তারপর কখন একসময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো, তা সে নিজেও জানলো না।...

এমনি ক'রেই কিছুকাল কেটে গেল।

কিন্তু শরীর আর শোধরালো না লালনের। এদিকে ভিক্ষেয় না বেরোলে চলে না, অথচ শীতল আর ভোলার তাতে ঘোর আপত্তি। বললো, 'আমরা যদি কিছু না-ই আনতে পারবো, তবে এতকাল আমরা আপনার কাছ থেকে কী শিখলাম সাঁইজি?'

লালন বললো, 'আমি যখন থাকবো না, তখন তো এ আখড়া তোরাই দেখবি! নিজেরা হাতে হাতে বেড়া বেঁধে যদি আশ্রম গড়ে তুলতে পারলি, তবে তাকে বাঁচাতে পারবি নে, তা কি হয়! সে কিছু নয়। সারাজীবন ঘুরে ঘুরে এখন ঘরে বসে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। না বেরোতে পারলে আমার হয়তো পরমায়ুই কমে যাবে!'

শীতল আর ভোলার মুখে উত্তর জোগালো না, জবাবটা এলো এবারে সাকিনার মুখ থেকে। বললো, 'বেশ তো, সকাল বিকেল বেড়াবার তো এখানে জায়গার অভাব নেই, শীতল আর ভোলাকে নিয়ে রোজ তুমি বেড়িয়ে এসো, কেউ বাধা দেবে না।'

সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে ঠোঁটে হাসি টেনে লালন বললো, 'আমি এমন আখড়াই বেঁধেছি যে, আমার শিষ্যদের গুরু-মার শাসনেই আমি অস্থির। বলি, ঘরে ব'সে নাম-গান করতে পারলে কেউ কি ঘর ছেড়ে বেরোয়?'

সাকিনা বললো, 'দয়া ক'রে তাই তুমি বেরিয়ো না।'

আর কথা না কেটে লালন এবারে মনে মনে গান ধরলো—

আমার চরকা ভাঙা টেকো আড়ানে,
টিপে সুতো কাটবো কতো,
আর তো প্রাণে বাঁচি নে।
একটি আঁটি আরটি খসে,
এবে তো চরকা নিয়ে
যাবো কোন্ দেশে ?
আমি আর কত কাল ঘুরবো এ হাল
এবে তো চরকার গুণে !
কি বা ছুতোর ব্যাটার গুণ পরিপাটি,
ওগো ষোল কলে ঘুরায় টেকোটি,
ও তার একটি কলে বিকল হলে
সারতে পারে কোন্ জনে ?
সামান্য কাঠ পাটের চরকা নয়,
ও সে ভাঙলে পরে জোড়া দেওয়া যায়,
মানব দেহো চরকা সে হো,
লালন কি তার ভেদ জানে !

এমনি ক'রে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল।

সেদিন ভোরের দিকে কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল—সাকিনার বাবা সুবিদ আলী বিশেষ অসুস্থ। সাকিনাকে একবার দেখতে চেয়েছে।

লালনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবধি পিতৃগৃহে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি সাকিনার। যদি সাধারণ গৃহস্থ-জীবন হতোও, তবু কথা ছিল, কিন্তু লালন গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী ফকির, সাকিনা আজ ফকিরাণী। গৃহস্থ-জীবনে ফিরে গিয়ে রাত্রিবাস করার রীতি নেই ফকির-জীবনে। কথাটা ভাবতে গিয়ে খানিকটা ইতস্তত করছিল সাকিনা।

বুঝতে পেরে লালন বললো, 'বাপ-মা সংসারে সাক্ষাৎ দেবতা, যে-কোনো অবস্থাতেই গিয়ে বাপ-মা'র পরিচর্যা করা যায়, তার চাইতে বড় ধর্ম কোনো মঠে, মসজিদে বা আখড়ায় নেই। চলো, আমি নিজে গিয়ে

তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। এই অবসরে আমিও গিয়ে দু'দণ্ড তোমার বাপজানকে দেখে আসতে পারবো।'

সাকিনা বললো, 'কিন্তু তুমি নিজেই যে অসুস্থ! তোমাকে ফেলেই বা আমি কি ক'রে যাই!'

লালন বললো, 'আমার জন্যে এত ভাববার কি আছে! শীতল আছে, ভোলা আছে, সবাই তো রয়েছে, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। তুমি বরং দরকার মতো দু' একদিন তোমার বাবার কাছে থেকে এস।'

এবারে আর কথা কাটলো না সাকিনা।

তাকে নিয়ে গিয়ে সুবিদ আলীর ঘরে পৌঁছাতেই কেমন একটা চাপা গোঙানীর শব্দ কানে ভেসে এলো লালনের! সত্যিই বড় কঠিন অসুখ সুবিদ আলীর। কথা বলবার শক্তি নেই। দু'-একজন জ্ঞাতি-কুটুম্ব যারা আছে, তারাই দেখাশোনা করছিল, এবারে সাকিনা আসায় কিছুটা স্বস্তি পেলো তারা। সাকিনা এসেই যে বাবার শিয়রে বসলো, আর উঠলো না।

এমনি করেই দিন দু'তিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

লালন রোজই একবার ক'রে গিয়ে দেখে আসতে লাগলো। বাকী সময়টা একান্তে ঘরে বসে আপন মনে গান গেয়ে কাটালো।

সেদিনও সকালে বসে বসে গান করছিল লালন—

দেখলাম এ সংসার ভোজের বাজি প্রায়,
দেখতে দেখতে তেমনি কে বা কোথায় যায়!
মিছে এ ঘরবাড়ি—মিছে টাকাকড়ি,
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়!
কৃতিকর্মার কীর্তি কে বুঝিতে পারে!
সে বা কোথায় জীব, কে লয় কোথায় ধরে?
সে কথা আর আমি শুধাইব বা কারে!
ও তার নিগূঢ়তত্ত্বে মত্ত কে বলবে আমায়।
যে করে এই লীলা, তারে তো দেখলেম না,
আমি আমি বলি আমি আর কোন্ জনা,

মরি! মরি! কি এই আজব কারখানা,
এবার গেলে পরে কিছুই ঠাওর নাহি হয়।
ভয় ঘোচে না আমার দিবস-রজনী,
কার সাথে কোন্ দেশে যাবো রে না জানি,
সিরাজ সাঁই কয় আজ বিষম ফেরে গণি
পাগল হয়ে রে লালন যতন জানাতে চায়।

একসময় শীতল আর ভোলা এসে কাছে দাঁড়ালো।

গান শেষ হলে লালন জিজ্ঞেস করলো: 'কি রে, কিছু বলবি?'

শীতল বললো: 'গুরু-মা গিয়ে অবধি সারা আখড়াটা ক'দিন ধরে যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কবে আসবেন গুরু-মা?'

লালন বললো, 'ওর বাবা একটু ভালো হয়ে উঠলেই চলে আসবে।'

ভোলা জিজ্ঞেস করলো: 'ততদিন আমরা গিয়ে গিয়ে গুরুমাকে দেখে আসতে পারি না?'

লালন বললো, 'না পারবি কেন! কিন্তু গিয়েই বা কি করবি? রোগীর শিয়রে বসে গুরু-মা তো মন খুলে তোদের সঙ্গে দু'টো কথা বলতে পারবে না।'

ভোলা বললো, 'আমরা শুধু গুরু-মাকে দেখেই চলে আসবো।'

হেসে লালন বললো, 'বেশ, তাই যাস।'

খুশী হয়ে এবারে নিজেদের কাজে চলে গেল শীতল আর ভোলা সা।

গানের সুর কেটে গিয়ে নিরেট বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না লালনের। অথচ শরীরের অবস্থাটা এমন নয় যে, কোথাও দূর গ্রামে গিয়ে ঘুরে আসবে সে। তবু মনের জোরে উঠে একবার মাতব্বরকে এসে কিছুক্ষণ আদর করলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মনের খুশীতে স্বভাবগতকণ্ঠে একবার ডেকে উঠলো মাতব্বর, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ—।'

লালন বললো, 'যাবি? চল্ একবার ঘুরে আসি।'

নীরবে মাতব্বর এবারে কেমন যেন একটা উদাসীন দৃষ্টি তুলে

ধরলো লালনের মুখের দিকে।

লালন জিজ্ঞেস করলো: 'কি রে, কি দেখছিস এমনি ক'রে তাকিয়ে?'

মুখ নিচু ক'রে নিল এবারে মাতব্বর।

লালন বললো, 'চল, দেখে আসি—যদি কিছু মেলে!' বলে তার পিঠের উপর চেপে বসলো সে।

মন্থরগতিতে এবারে সামনের পথে পা বাড়ালো মাতব্বর।

চির সবুজ প্রকৃতির শোভায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল লালনের। বনরাজিনীলার উদ্দেশেই একবার সে উচ্চারণ করলো: 'এ জীবনে তোমার কত রূপই দেখলাম প্রকৃতিসুন্দরী! কখনও তুমি রিক্তা, কখনও তুমি পরিপূর্ণা, কখনও তুমি ভীষণা, কখনও তুমি লাস্যময়ী। কখনও মা হয়ে, কখনও জায়া হয়ে, কখনও আমার মনের মানুষ হয়ে কত রূপেই যে তুমি আমাকে দেখা দিলে! তোমার অনন্ত মহিমার উদ্দেশে আমার শতকোটি প্রণাম।'

মাতব্বর একই গতিতে এগিয়ে চলছিল। চলতে চলতে সামনে কিছু ঘনবসতি পেয়ে লালন একসময় নেমে পড়লো। তাকে দেখতে পেয়ে কয়েকটি বাচ্চা ছেলে একসঙ্গে হুল্লোড় ক'রে উঠলো: 'ফকির এসেছে, ঘোড়া এসেছে, আমাদের বাড়ি চলো ফকির, না না, আগে আমাদের বাড়ি।'

খুশীর হাসি হেসে লালন বললো, 'যাবো, তোমাদের সকলের বাড়িতেই যাবো, চলো।' বলে একটি ছেলেকে অনুসরণ ক'রে তাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে একতারায় সুর তুললো লালন—

দেখ ভাই রাবের গাছে ফুল ফুটেছে
মীন রয়েছে তার ভিতরে।
দেখ মন আদম ছবি, আল্লা নবি,
তিনজন গাছে খেলা করে।
দেখ মন রাবের ফেনা, যাবে জানা,
আল্লা নবি বলো যারে,

দেখলাম এক রজগুপি কল, ডাল ছাড়া ফুল,
মূল ছাড়া ফল তার ভিতরে।
লালন কয় রাবের ফেনা, যাবে জানা,
আল্লা নবি আছে তার ভিতরে।

ততক্ষণে একটি মধ্যবয়স্ক যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল। ধনী পরিবারের ছেলে, তবু ফকির লালনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল। গান শেষ হলে সে বললো : 'আমি যদি কিছু টাকা আর কাপড় এনে দিই, তবে আপনার শিষ্যদের উপকার হবে তো সাঁইজি ?'

লালন বললো, 'আপনাদের দানেই তো তারা দু'টো নাম করবার সুযোগ পাচ্ছে! আপনার দান যে খোদাতালারই দান দাদাসাহেব!'

যুবকটি এবারে অন্দরে গিয়ে কিছু টাকা আর কাপড় এনে লালনের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'আমি আপনার গানের ভক্ত, সাঁইজি। এ টাকা আর কাপড় আপনার আখড়ার কাজে লাগলে আমি আনন্দ পাবো।'

সেই টাকা আর কাপড় কপালে ছুঁইয়ে লালন বললো, 'আপনার হাত দিয়ে এ যে আমার মনের মানুষই আমাকে দিলেন আপনার কল্যাণ হোক দাদাসাহেব।'

বাচ্চা ছেলেরা খেলায় মত্ত হয়ে আবার কোন্‌দিকে গিয়ে ততক্ষণে হুল্লোড় জুড়ে দিয়েছিল।

এবারে আবার মাতব্বরের পিঠে চেপে বসলো লালন। কিন্তু এ কি ? শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো কেন ? বুকের ভিতরটা মনে হচ্ছে ধুক্‌ধুক্ করছে। একবার ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো লালন—রোদে খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। বেলা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। হয়তো অসুস্থ শরীরে এতক্ষণ রোদের তাপটা সহ্য হয়নি। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে; মনে হচ্ছে—এখনই মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে লালন। আখড়াও কাছে নয়, প্রায় দেড় ক্রোশের পথ। বুকটাকে সজোরে একবার চেপে ধরে বললো : 'আমার বোধ করি

সময় হয়ে এলো মাতব্বর, একটু জোরে চল, নইলে গিয়ে আর পৌঁছাতে পারবো না।'

মাতব্বর আর একবার চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠে দ্রুত পা চালালো।

কিন্তু দেহটাকে আর বয়ে নিতে পারছিল না লালন। মাতব্বরের পিঠের উপরেই কোনোরকমে মাথাটাকে ঠেস দিয়ে আপ্রাণ শক্তিতে তাকে আঁকড়ে ধরে রইল। কিন্তু সেই মুঠোও একসময় শিথিল হয়ে গেল।

আখড়ার আঙিনায় এসে মাতব্বর যখন আর একবার চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দে ডেকে উঠলো, চারদিক থেকে শিষ্যরা সবাই দৌড়িয়ে এলো, ছুটে এলো শীতল আর ভোলা। সকাল থেকে সাঁইজিকে আখড়ায় না পেয়ে তারা ভেবেছিল—এ ক'দিনের মতো আজও বোধ করি সুবিদ আলীকেই দেখতে বেরিয়েছেন সাঁইজি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে ভুল ভাঙলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো—মাতব্বরের পিঠের উপর থেকে অর্ধেকটা দেহ ঝুলে পড়েছে সাঁইজির। চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠলো শীতল আর ভোলা—'কি সর্বনাশ, তোরা কেউ ছুটে গিয়ে শীগ্‌গির গুরু-মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।' বলে ধরাধরি ক'রে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে নিয়ে ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দিয়ে পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

মাণিক দৌড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সাকিনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো।

এসে আছড়ে পড়লো সাকিনা।—'আমি ঘরে না থাকার সুযোগ নিয়ে শেষপর্যন্ত এই কি তুমি ক'রে বসবে ঠিক করেছিলে? চোখ খোলো, কথা বলো, কই, চোখ খোলো।'

মাথায় জলের ধারা দিয়ে অনবরত হাওয়া দিচ্ছিল শীতল। ভোলা সা এবারে লালনের বুকে হাত স্পর্শ ক'রে বললো, 'আপনি উতলা হবেন না গুরু-মা, সাঁইজির দেহে এখনও প্রাণ আছে। সংজ্ঞা

ফিরে আসতে দেরি হবে না। আপনি বরং গরম দুধ এনে সাঁইজির মুখে একটু একটু ক'রে দিন। শরীরে তো কিছু নেই, তবে যদি পেটে গরম দুধ পড়লে একটু চাঙ্গা হন !'

পাগলিনীর মতো সাকিনা তাই করলো।

এমনি ক'রে পড়ন্ত বেলায় একসময় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরলো লালনের। কিন্তু ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকাতে পারলো না। বুকের ভিতরটা ধুকপুক্ করছে। চোখ মেলে যে তাকাবে, চোখের শিরাগুলোর এমন জোর নেই। তেম্‌নি অচেতনের মতো পড়ে থেকেই একসময় আপন মনে সে উচ্চারণ করলো : 'সাকিনা, তুমি কোথায় ?'

—'এই তো আমি তোমার কাছেই আছি।' স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সাকিনা বললো, 'বলো, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার, বলো ?'

অস্ফুটকণ্ঠে লালন বললো, 'না, কিছু কষ্ট নেই তো !'

সাকিনার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, বললো, 'তোমার কেন কষ্ট থাকবে, সব কষ্ট যে আমার ! আমাকে এম্‌নি ক'রে তুমি কষ্ট দিতে পারলে ?'

লালনের মুখে এবারে কথা ফুটলো না। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে থেকে একসময় সে নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুট-গুঞ্জনে সুর টানলো—

আমার দিন কি যাবে এই হালে,
আমি পড়ে আছি অকূলে।...

শিয়রে বসে সাকিনা অনর্গল অশ্রু-বিসর্জন করতে লাগলো।

সন্ধ্যের দিকে বোধ করি কিছুক্ষণের জন্য ঘুম নেমে এলো লালনের চোখে। লক্ষ্য ক'রে গুরু-মার পাশে এসে শীতল বললো, 'আপনি তো সেই কখন থেকে ঠায় বসে আছেন, এবারে যান, কাত হয়ে একটু জিরিয়ে নিন, আমি সাঁইজির কাছে আছি।'

অশ্রুবিগলিত-কণ্ঠেই সাকিনা বললো, 'কোন্ মন নিয়ে আমি জিরোব শীতল, বলতে পারো ? ওদিকে আব্বা মৃত্যুশয্যায়, এদিকে তোমাদের সাঁইজি। আমি কি করবো, কিছু যে ভেবে পাচ্ছি না !'

প্রবোধ দিয়ে শীতল বললো, 'ভেবে কিছু লাভ নেই গুরু-মা, সবই তো ঈশ্বরই করাচ্ছেন, তিনি যা করবেন, তাই হবে। যান, আপনি গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

কিন্তু সে-কথায় সাড়া দিল না সাকিনা, বললো, 'তোমার হাতেও তো কাজ কিছু কম নেই, তুমি গিয়ে বরং সেগুলো করো, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না, আমি বসি।'

রাত্রির দিকে কিছুক্ষণের জন্য একবার চোখ মেলে তাকালো লালন। তাকাতে কষ্ট হলো, তবু কেমন যেন কিছুক্ষণের জন্য চোখ মেলে ঘরের চারদিকে কি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো।

সাকিনা জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছো এমনি ক'রে? এবারে কিছু খাও, এনে দিই, কেমন?'

কিন্তু সে কথায় সাড়া না দিয়ে আবার চোখ বুজলো লালন।

সাকিনা বললো, 'কই, কিছু বললে না তো আমাকে! কিছু জিজ্ঞেসও তো করলে না?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় অস্ফুটকণ্ঠে লালন বললো, 'শীতল আর ভোলা তোমার ছেলের মতো, ওদের দু'টির তুলনা নেই। বাকী যারা, তাদের কেউ কেউ শুনেছিলাম অনাচারে মেতেছে। শীতলকে বুঝিয়ে বোলো—ওদের জন্যে যেন আলাদা ব্যবস্থা করে। ওরা এখানে থাকলে আখড়ার দুর্নাম হবে, তোমার নামে কলঙ্ক আসবে।' থেমে পুনরায় কাতরকণ্ঠে লালন বললো, 'তুমি কাঁদছো কেন সাকিনা? তোমার চোখে জল আমি সইতে পারি না। তুমি যে আমার ভৈরবী, আমার বৈষ্ণবী, ফকিরাণী। তোমার মধ্য দিয়ে আমি যে এতকাল আমার মনের মানুষকেই চেয়েছি! ছিঃ, চোখের জল মুছে ফেল বউ। আমাকে একটু পানি দাও, বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

উঠে তাড়াতাড়ি একবাটি দুধ আর জল নিয়ে এলো সাকিনা। বললো, 'আগে দুধটুকু খেয়ে তবে পানি খাও। হাঁ করো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।' বলে ধীরে ধীরে স্বামীকে খাইয়ে দিতে লাগলো সাকিনা।

এমনি ক'রেই একসময় রাত্রিটা কেটে গেল।

ভোরের দিকে সাকিনার একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল; কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। লালনের অস্ফুট কণ্ঠের সুরে সেটুকু ভেঙে গেল। রুদ্ধকণ্ঠেই লালন গান করছিল—

পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে!
ক্ষম হে অপরাধ আমার ভবকারাগারে।
জলে-স্থলে সব জায়গায়
তোমার সব কীর্তিময়
বিবিধ সংসারে,
না বুঝে অবোধ লালন
পড়লো বিষম ঘোরতরে।

সাকিনা চোখ মেলে তাকাতেই গান থেমে গেল লালনের। কিন্তু লালনের কণ্ঠে গান থামলেও কাছে দূরে কেমন যেন এক মধুর হরি-সংকীর্তন আর শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। ভোলাকে কাছে ডেকে সাকিনা জিজ্ঞেস করলো: 'বাইরে আজ এত গান আর শঙ্খধ্বনি হচ্ছে কেন ভোলা?'

ভোলা বললো, 'আজ যে গার্শীর দিন। প্রতি বছর এই দিনে সারাগ্রাম ভরে সংকীর্তন চলে আর সন্ধ্যায় শুরু হয় দেয়ালী উৎসব। আপনি বুঝি এরই মধ্যে সব ভুলে গেছেন গুরু-মা?'

সাকিনা বললো, 'আমার আর কোনোদিনের কথাই মনে নেই ভোলা। মনে হচ্ছে—আমি যেন আগেকার সবকিছু ভুলে গেছি।'

ভোলা বললো, 'না, না, ভুলে যাবেন কেন গুরু মা? দু'দিকের চাপে পড়ে এখন আপনার মাথার কিছু ঠিক নেই, তাই, নইলে কেউ কি অতীতের কথা ভুলে যেতে পারে?'

—'আর অতীত!' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিল সাকিনা।

ভোলা আর কিছু-একটাও না বলে দাওয়ার একপাশে নীরবে বসে রইল।

সারাদিন কেটে গেলে সন্ধ্যার দিকে সারা গ্রাম আলোকসজ্জায় সেজে উঠলো। কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ্য দেবার অবকাশ হলো না।

একসময় শীতল আর ভোলাকে কাছে ডেকে মুমূর্ষু কণ্ঠে লালন বললো, 'আয়, আমার কাছে বসে দু'টো গান কর তোরা। আমার বোধ করি এ জীবনে সব গান ফুরিয়ে গেল। আমার পুনামাছের ঝাঁক কোথায় তোরা, আয়। বসে বসে আমাকে গান শোনা।'

শীতল আর ভোলা এবারে একতারায় সুর তুলে গুনগুন ক'রে গান ধরলো—

সাধ্য কি রে আমার সেরূপ চিনিতে—
দিবানিশি মায়াঠুসি জ্ঞান চক্ষেতে।
ঘরের ঈশানকোণে হামেশ ঘড়ি,
সেই নড়ে কি আমি নাড়ি
পাই না দেখিতে।
আমি আর সে অচিন একজন,
এ জগতে থাকি দু'জন,
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন
গেলে ধরিতে;
ঢুঁড়ে হদ্দ মেনে গেছি,
এখন ব'সে খেদাই মাছি,
লালন বলে—মরে বাঁচ
কোন্ কার্যেতে।

লালনের কণ্ঠ ক্রমেই রোধ হয়ে আসছিল; ক্রমেই কেমন একটা চাপা ব্যথায় সারা বুকখানি তার ছেয়ে যাচ্ছিল। একবার কাতরোক্তি ক'রে উঠলো লালন: 'উঃ, আর পারি না; বড় জ্বালা, বড় ব্যথা। এ ঘর ছেড়ে যাবার আমার সময় হয়ে এলো রে, তবু আজও বুঝলাম না—এ ঘরে কে বিরাজ করে! তোরা গান কর শীতল, আমি শুনতে শুনতে চোখ বুজি।'

শিয়রে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল সাকিনা।

শীতল আর ভোলা পুনরায় গান ধরলো—

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে !
আমি জনম ভরে একদিন দেখলেম না রে !
আপন ঘরের ঠিকানা হয় না.
মনে বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর বলতে পরমেশ্বর
সে বা কিরূপ আমি কিরূপ রে !

গাইতে গাইতে কখন একসময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। নিশাচর পাখিগুলো কখন প্রহরে প্রহরে হাঁক দিয়ে গেছে, কারও কানে আসে নি : ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার কেটে প্রাগূষার আবছা আলোয় পূর্বদিগন্ত ফর্সা হয়ে আসছে। দূর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে কানে। কোথাও কেউ নামাজ পড়ছে, তারই ধ্বনি।

সেই ধ্বনিকে আচ্ছন্ন ক'রে হঠাৎ একবার লালন বলে উঠলো : 'তোরা সুখে থাক, আমি চললাম।' বলতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখ দু'টি স্থির হয়ে গেল।

তার জীর্ণসার বুকের উপর আছড়ে পড়ে চোখের জলে সে-বুকের সবখানি ভাসিয়ে দিল সাকিনা। বললো : 'আমাকে নাও, আমাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যে তোমাকে বৈ আর কিছু জানি না !'

কিন্তু সে-কান্নায় আর একটিবারের জন্যও সাড়া মিললো না লালনের।

পূর্বদিগন্তে তখন তরুণ সূর্যের রক্তিম আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

পরিচায়িকা

বাংলার বাউল ও বাউল রাজা লালন ফকির

মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা নানা সাধক-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই, তার একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে বাউলকে আশ্রয় ক'রে। মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়াবাদের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এই বাউল। তারও বহু আগে থেকে বাউলের ইতিহাস রচিত হ'য়ে আসছে। এদের আদি-পুরুষ হিসেবে ঋকবেদের ব্রাত্যদের ধরা যেতে পারে। বৈদিক যুগের সমগ্র আচার-বিচারের তারা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বাউলদের মধ্যেও যুগ-ব্যতিক্রমতার লক্ষণ স্পষ্ট। পরবর্তীকালে নাথযোগীদের সম্পর্কে নাথপন্থী বাংলা সাহিত্যে যা পাওয়া যায়, তাতেও বাউলধর্মী রীতির পরিচয় মেলে। নাথযোগীরা ছিল ভ্রমণশীল সম্প্রদায়, বাউলদের মধ্যেও সে-ভ্রাম্যমাণতা লক্ষ্য করবার মতো। গোরক্ষ-বিজয়ে বা মীনচেতনে যে 'কায়াসাধন'-এর উল্লেখ দেখা যায়, তাও বাউলদের সাধনারই কথা। সুফী-সম্প্রদায়ের সাধনাও অনুরূপ। নাথযোগীদের প্রধান ব্রত ছিল ত্যাগ, সুফীদের প্রধান ব্রত ছিল প্রেম। বাউলদের মধ্যে এই উভয় শ্রেণীরই প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই তাঁরা বস্তু থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে মহাশূন্যতার পথে জ্যোতির্ময় আত্মার সন্ধান করেছেন। আত্মাকে না জানলে কোনো সাধনারই সিদ্ধি নেই। উপনিষদ বলেছেন—'আত্মানং বিদ্ধি'; বলেছেন—'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ', অর্থাৎ—সেই পরম পুরুষকে না জানলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার নেই। তাঁকেই বাউলেরা 'মনের মানুষ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।'—এই মন-মাঝি বা মনের মানুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি নেই। নিজের অহং ছাড়তে পারলে তবে সেই পরমহংসের সাধনার সিদ্ধি। নিরন্তর তাঁরই খোঁজ

ক'রে বাউল বলেছে—

'আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাবো তারে ?'

তাঁরই সন্ধানে বাউল অনন্তকাল ধরে সংসার-পথ পেরিয়ে চলেছে অজানালোকের পথে, মহাশূন্যের পথে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ এর একটি প্রধান আধার। অধরার যে সাধনা, ধরার বন্ধনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায় না। তবু নিত্য তাঁরই সন্ধানে প্রাণ ছুটে চলে : —

'আমি কি সন্ধানে যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
অন্ধকারে জ্বলছে বাতি
দিবারাত্র নাই সেখানে।'...

সংসারের নিত্য দাবদাহ পাছে প্রতিকূল হয়ে বাধা দেয়, চিরকাল তাই এই বাউলেরা গৃহছাড়া। লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যাবে—বৌদ্ধ দোঁহা ও বাউল শেষপর্যন্ত একস্তরে এসে মিলেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তুলনামূলক আলোচনা-সাহিত্যে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে : 'বাংলাদেশের আউল বাউল নিরঞ্জনীদের মধ্যেও এই শূন্যবাদ পাই। শ্রীহট্ট বিঠঙ্গলের মঠের মতবাদে, অষ্টগ্রামী ও দক্ষিণ শাহবাজপুরী বাউল সমাজে, উত্তরবঙ্গের কমলকুমারী মাঝবাড়ী মধ্যমা মতে, বিক্রমপুর নরসিংদী বাউল সমাজ এবং রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে সর্বত্রই শূন্য ও সহজের খুব বড় স্থান।'

এই শূন্যবাদ ও সহজবাদ বিষয় দুটি জানবার প্রয়োজন। বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে শূন্যতত্ত্বের পরিচয় আছে। শূন্যপুরাণের উল্লেখ থেকে দেখা যায়—শূন্যতত্ত্ব প্রচারে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টিবাদের প্রভাব ছিল। 'অসঙ্গম্, অস্পর্শম, অরূপম, অব্যয়ম' বলে উপনিষদ ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনের কোনো তারতম্য নেই। বুদ্ধদেবের মতে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড অনাত্মক। তাতে আত্মার প্রশ্ন নেই। সহজবাদ কিন্তু একেবারেই স্বতন্ত্র জিনিস। লালন ফকিরের একটি গানে এই সহজবাদের

প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—

'সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা,
ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা।...'

এই ভাবটিকেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন—'সুখ বা দুঃখে চিত্তের কোনো পরিবর্তন হবে না—বাস্তব জগতের কোনো আঘাতেই মন চঞ্চল হবে না—এই উদাস অবস্থাই হচ্ছে সহজ অবস্থা। বৌদ্ধ সহজ মানে সিদ্ধারা বলেছেন—সহজে ভাব-অভাব নাই, পাপ-পুণ্য নাই, রাগ-বিরাগ নাই, সহজ স্বভাবতঃই নির্মল।'...

কিন্তু এই সহজবাদের পথ গুরু ভিন্ন নিরাপদ নয়। এই গুরুকে বাউলেরা আখ্যা দিয়েছেন 'সাঁই' বলে। 'মুর্শীদা' আর 'মারফতি' গান বাউলেরই দু'টি বিশেষ স্তর। বৌদ্ধধর্মজাত গুরুবাদের প্রভাব পারস্যে এবং সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই বৌদ্ধ গুরুবাদের সঙ্গে সুফী গুরুবাদের মিলন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। মুসলমান সুফীরা এবং বৌদ্ধ শ্রমণেরা একইভাবে গুরুকে শ্রদ্ধা করতেন।—এই শূন্যবাদ সহজবাদ ও গুরুবাদ মিলিয়ে তবেই বাউল তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেকে এই বাউলের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে বলেও অনুমান করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

'বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

এই সূত্র থেকে যদি বৈষ্ণবে ও বাউলে কিছু একটা সম্বন্ধ দাঁড় করানো যায়, তবে বোধ করি অনেকেরই আপত্তি থাকে না।

বাউলেরা সর্বত্রই কিন্তু তাঁদের বাউল বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন—

'তাইতে বাউল হইনু ভাই,
এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের
আর তো দাবী-দাওয়া নাই।'

ভারতের শাস্ত্রীয় ভাববাদ ও লৌকিকবাদের একত্র সমন্বয় ও বিস্তৃতি ঘটেছে এই বাউলে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় সর্বপ্রথম বাউলের জন্ম। ষোড়শ. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁদের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং একসময় মহাপ্রভুও যে এই বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনুমান ক'রে নিতে কষ্ট হয় না। আঞ্চলিক ভঙ্গিতে এই বাউলদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেছেন—'পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব কাঠামোর উপর চুনকাম করিয়া বাউল সাজিয়াছে, পূর্ববঙ্গে ইস্‌লাম কাঠামোর উপর রং দিয়া ফকির সাজিয়াছে, পূববঙ্গের বে-সরা ফকির এবং পশ্চিমবঙ্গের বাউল এক আধ্যাত্মিক মিরাসের উত্তরাধিকারী।'

দুই

সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর শ্রেণীদের মধ্যে বাউলের প্রাধান্য দেখা গেলেও কালক্রমে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বাউলের প্রাণরস বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বাংলা সঙ্গীতের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে এই বাউল। —সমস্ত শ্রেণী থেকে তাঁরা একেবারেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। অনেকটা আপনভোলা বা উদাসী বলে লোকে তাঁদের বাতুল বলে মনে করে; কিন্তু আসলে তাঁরা তা নন। বাউল ভিন্ন তাঁদের কোনো স্বতন্ত্র জাত নেই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে নিলে গড়ে উঠেছে এই বাউল-সম্প্রদায়। তা বলে তাঁদের মধ্যে কোনো রেশারেশি নেই, বরং হিন্দু-মুসলমান মিলনের তাঁরা উদগাতা।

বাংলার বাউল সাধকদের অন্যতম বাউল লালন ফকির। বাউল সাম্রাজ্যের রাজা তিনি। জাতিতে তিনি কায়স্থবংশজাত হিন্দু ছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি মননবিদ্যার দ্বারা সাধনমার্গে পৌছান। মুখে মুখে লালন বহু সহস্র গান রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর শিষ্য ও শিষ্যাদের মাধ্যমে সে-সব গান এখনও মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে।

রাজা রামমোহন রায় ও লালন ফকির একই বছরে ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক একশো ষোল বছর বেঁচেছিলেন। ১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি লোকান্তরিত হলে কুষ্টিয়ার পাক্ষিক পত্রিকা 'হিতকরী' ৩১শে অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন—

'লালন ফকিরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রংপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য। শুনিতে পাই—তাঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর, ইঁহাকে আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে। আখড়ায় ১৫/১৬ জনের অধিক শিষ্য নাই। শিষ্যদিগের মধ্যে শীতল ও ভোলাই নামক দুইজনকে ইনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন,...আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন; সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতানুসারে ইঁহার কোনো সন্তান-সন্ততি হয় নাই।...তিনি কোনো শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু ধর্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক ধর্মসাধনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার জানিবার অবশিষ্ট ছিল না। লালন ফকির নিজে কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না; অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাঁহাকে আপন বলিয়া জানিত। মুসমানদিগের সহিত তাঁহার আহার-ব্যবহার থাকায় অনেকে তাঁহাকে মুসলমান মনে করিত, বৈষ্ণব-ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত। জাতিভেদ মানিতেন না, নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে ইঁহাকে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য নহে, কিন্তু ইঁহাকে ব্রাহ্ম বলিবার উপায় নাই; ইনি বড় গুরুবাদ পোষণ করিতেন। অধিক কি, ইঁহার শিষ্যগণ ইঁহার উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত না। সর্বদা 'সাঞ' এই কথা তাহাদের মুখে শুনিতে

পাওয়া যায়। ইনি নামাজ পড়িতেন না, সুতরাং মুসলমান কি প্রকারে বলা যায়? তবে জাতিভেদহীন অভিনব বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে, বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইহার অধিক টান।...কিন্তু সময় সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইহার মুখে শুনা যাইত, তাহাতে তাঁহার মত ও সাধন সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত।...সাধারণে প্রকাশ, লালন ফকির জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কুষ্টিয়ার অধীন চাপড়ার ভৌমিক বংশীয়েরা ইহার জ্ঞাতি। ইহার কোনো আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি নাকি তীর্থভ্রমণ-কালে পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় একটি মুসলমানের দয়া ও আশ্রয়ে জীবনলাভ করিয়া ফকির হন।...তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন, এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে যাইতেন...।'

জানা যায়—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত কুষ্টিয়ার পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে কুষ্টিয়ার তৎকালীন খ্যাতিমান আইনজীবী রাইচরণ দাস 'মহাত্মা লালন ফকির' শিরোনামে 'হিতকরী'র এই সম্পাদকীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছেন: 'ইহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।...ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন না। শিষ্যরা হয়ত তাঁহার নিষেধক্রমে, না হয় অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।...ইনি ১১৬ বৎসর বয়সে গত ১৭ই অক্টোবর (১৮৯০) শুক্রবার প্রাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন এবং অশ্বারোহণে স্থানে স্থানে যাইতেন।' সম্প্রতিকালে কুষ্টিয়ার গবেষক-অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী উল্লেখ করেছেন: 'ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়ও রাইচরণ দাসের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'কুষ্টিয়ার উকিলবাবু রাইচরণ দাস, কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান ও জীবনের অনেক ঘটনা জানেন!...'

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গেও লালন ফকিরের সংস্পর্শ ঘটে এবং প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং উত্তরকালে লেখেন : 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি, বাউল-সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকালের আধুনিক।...শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি।'

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, 'লালন ফকির অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠে স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে কি অপরূপ ভাব ও সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে! তিনি জটিল ও নিগূঢ় অধ্যাত্মসাধনা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জলভাবে ও সরল ভাষায় তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মরমিয়াবাদ তাঁহার চিত্তে প্রয়াগসঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে।...মিসেস্ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ার নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের শিলাইদহ অবস্থানকালে লালন প্রায়ই তাঁহাদের বোটে আসিতেন। তিনি প্রায়ই তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন।'

তাঁর সম্পাদিত 'হারামণি' লোকসঙ্গীত সঙ্কলনে লালনের কিছু গান সন্নিবেশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা-কালেক্টার ছিলেন, তখন তিনি লালন সম্পর্কিত কিছু তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়াস পান। কুষ্টিয়ার প্রাক্তন মুন্সেফ ডক্টর মতিলাল দাশও লালনের বহু গান সংগ্রহ ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি যখন কুষ্টিয়ায় মুন্সেফ ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের সহযোগিতায় সেঁউড়িয়া গ্রামের লালন ফকিরের গানগুলি সংগ্রহ করি। এইটিই সর্বাধিক গানের সংগ্রহ—৩৭১টি গান।—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

সংগ্রহ মিলিয়ে লালন-গীতিকা নামে একখানি চমৎকার বই বার করেছেন। লালনের নাম আজ শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হলেও খুব কম লোকেই এই রসময় সঙ্গীতগুলির রসাস্বাদন করেছেন। লালন ফকির এবং বাউলেরা মানব-দেহকে দেবতার মন্দির বলে মনে করতেন, এই দেহ-দেউলে বাস করেন মানুষের মনের মানুষ,—সেই আত্মার উপলব্ধিই মানব-জীবনের চরম কাম্য।'

তিন

একদা আমি লালন ফকিরের ভিটে দর্শন ক'রে এই মহান সাধক সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহী হই। কার কাছ থেকে কিভাবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী জানা যায়, সে সম্পর্কে আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বাংলার বাউল-সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখিত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল প্রভৃতির রচনাবলী থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও এমন বহু ঘটনা অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেল—যা উদ্ধার করতে না পারা পর্যন্ত বাউল-জীবনকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি সেই উদ্ধারকার্যে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন বাউল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে আরও দীর্ঘকাল কাটালাম। অবশেষে মনে হলো—মণি-উদ্ধার হয়েছে। তাকে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়ে লালনের সুদীর্ঘ জীবন-নাট্যের নানা দৃশ্যাবলীকে আমি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে চোদ্দটি দৃশ্যে রূপায়িত করার প্রয়াস পাই। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, তথ্যগত জীবনী রচনা ও উপন্যাস রচনা এক বস্তু নয়। তবু এই উভয় রচনার মূল সূত্র একটিই। ইতিপূর্বে বাংলায় লালন সম্পর্কে সম্ভাব্য কিছু কিছু আলোচনা হলেও তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী উদ্ধার করা এতকাল সম্ভব হয়নি। নানা গবেষক তাঁকে নিয়ে —বিশেষতঃ তাঁর রচিত গান নিয়ে নানা সময়ে খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত-ভাবে আলোচনা ক'রে আমাদের লোকসাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে তাঁর সৃষ্টিকে ধরা গেলেও তাঁর সমগ্র জীবনকে ধরা যায়নি। 'বাউল রাজা'তেই প্রথম তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকে

কেন্দ্র ক'রে তাঁর গানের উৎস সন্ধান করা হয়েছে।

যখন এই উপন্যাস মাসিক 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার কোনো এক বার্ষিক শারদীয় সংখ্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়, বিপুল সাড়া পড়ে পাঠক-সমাজে। যশস্বী নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ বিশি প্রমুখ নানা শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ও সাহিত্যিক এই উপন্যাসের আশু নাট্যরূপায়ণে উৎসাহ প্রকাশ করেন। অনতিবিলম্বে চিত্র ও মঞ্চজগতের বলাই সেন তাঁর নিজের পরিচালনায় এই উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন যথাক্রমে নিউ এম্পায়ার ও মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। সঙ্গীতে অংশ নেন প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। অভিনয় চলে দীর্ঘদিন। ইতিমধ্যে All India Radio-র কলকাতা কেন্দ্র আমার এই 'বাউল রাজা'র নবনাট্যরূপ সোজাসুজি 'লালন ফকির' নামে সম্প্রচার করেন ৬ বার। লালনের ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন মজুমদার এবং সঙ্গীতে প্রাণ-সঞ্চার করেন অমর পাল। সুরকার অনিল বাগচীও এই নাটকের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত ছিলেন। দুই বাংলা এবং দূর-দূরান্তের হাজার হাজার শ্রোতা অভিভূতচিত্তে বেতারকেন্দ্রে চিঠি পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশ থেকে আমি কয়েকবার আমন্ত্রণও পাই। কিন্তু তৎপূর্বে তাদের পরিবেশিত সবাকচিত্র 'লালন ফকির' যেমন আমাকে আনন্দ দেয়নি, তেমনি খুশী হইনি নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে কলকাতায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'লালন ফকির' দেখে। এই সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি তিনবার কলকাতা বেতারে লালন সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাষণ দিই। সেসব ভাষণ তৎকালীন 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়াও নানা দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার আগ্রহে আমাকে 'বাউল ও লালন ফকির' বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ সময়ে বেহালা থিয়োসফিকাল সোসাইটি ও ড্রামাটিক ক্লাবের যৌথ আমন্ত্রণে আমাকে গিয়ে বাংলার বাউল এবং লালন ফকিরের জীবন ও সঙ্গীত সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করতে হয়। তাঁদের প্রদত্ত অভিনন্দন আমাকে অভিভূত করে। উদ্বোধক ছিলেন

খ্যাতিমান সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়।

এরপর ১৯৭৪ সালে লালন ফকিরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপস্থিত হলে দুই বাংলার পক্ষ থেকে আমি কলকাতার 'গান্ধর্বী' সঙ্গীত-শিক্ষায়তনে সাড়ম্বরে তাঁর জন্মজয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। 'গান্ধর্বী'র তখন আমিই সভাপতি। অনুষ্ঠানে পুরোধা হিসেবে এসে যোগ দেন অন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী লীলা রায় ও ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লালনগীতি পরিবেশন করেন অমর পাল, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য শিল্পী।

এরপর পশ্চিমবঙ্গের দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে স্যুভেনীর প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসময়ের আগে পর্যন্ত আমার প্রকাশিত গ্রন্থ ও নাট্যানুষ্ঠানের ফলে সারা দেশে যে বিপুল লালন-চেতনা গড়ে ওঠে, তার প্রভাবে নব্য-কালের কিছু উৎসাহী গবেষক-অধ্যাপক লালন চর্চায় মনোসংযোগ ক'রে বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসাহিত্য বিভাগে লালনকে সগৌরবে সংস্থাপিত করতে প্রয়াসী হন। এরকম দু'একজন নব্য গবেষক পত্র-পত্রিকা মারফৎ কিছু কিছু বক্তব্য ও রেফারেন্স সম্পর্কে আমার কাছে নানা প্রশ্ন রাখেন। আমি বিজ্ঞানসম্মত গবেষক নই, আমি জীবন-সন্ধানী রসসঞ্চয়ী মাত্র। তাই তাঁদের অনুসন্ধিৎসা পূরণ করা থেকে স্বাভাবিক কারণেই আমি নিজেকে বিরত রাখি। এদিক থেকে আমি অভিভূত হয়েছি বাংলাদেশের গবেষক-অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরীর অসাধারণ লালন-চর্চার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তিনি যেমন উদ্যমশীল কর্মী, তেমনি একনিষ্ঠ গবেষক। আমার মতের সঙ্গে তাঁর মতের আদর্শগত মিল বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতিময় অনুজ-অগ্রজ সম্পর্ক। তাঁর স্বভূমি কুষ্টিয়ার নিঃশ্বাসের মধ্যেই অবস্থিত লালনের জন্মক্ষেত্র ও সাধনক্ষেত্র। একদা এ সব অঞ্চল ছিল আমার বিচরণভূমি। সেই স্মৃতিই আমাকে চিরকাল লালনকেন্দ্রিক বাউলধর্মী ক'রে রেখেছে।

একসময় আমি গ্রামগঞ্জের বৈরাগী-বোষ্টমীদের পল্লীগীতির প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে যে-সব গান সংগ্রহ করি, তার মধ্যে বাউলেরও প্রাচুর্য ছিল। উত্তরকালে তা আমি কথা সহকারে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করবার সুযোগ গ্রহণ করি। গানে কণ্ঠ দান করেন বিখ্যাত কীর্তনীয়া রাধারাণী দেবী, কেচু চক্রবর্তী, কুসুম গোস্বামী, পূর্ণদাস বাউলের স্ত্রী মঞ্জু দাস প্রভৃতি। পরবর্তীকালে বাউল ও লালন নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আমার পুরণো কালের অনুশীলন আমার চিন্তা ও রচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

'বাউল রাজা'র প্রথম মোহন লাইব্রেরী সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর নানা কারণে দীর্ঘকাল গত হয়। প্রকাশক জীবনকুমার বসুর আকস্মিক মৃত্যুও তার একটি বিশেষ কারণ। সম্প্রতি 'সাহিত্যলোক'-এর সত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ তাঁর সংস্থা থেকে এ বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় আমি খুশী হই। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দীর্ঘজীবী হোন, এই কামনা করি। আর সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই আমার অগণিত স্নেহশীল পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে।

রণজিৎ কুমার সেন